স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত

বিপিনচন্দ্র পাল

(সংগ্রাহক : শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ)

বরিশাল সেবাসমিতি

কলিকাতা * ১৯৬০

প্রকাশক
বরিশাল সেবাসমিতি
৪, পূরণচাঁদ নাহার এভিনিউ
কলিকাতা-১৩

মূল্য : সাত টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
সুশীল প্রিণ্টার্স
২ ঈশ্বর মিল বাই লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

মুখবন্ধ

অশ্বিনীকুমার-স্মৃতিসভার এক উদ্যোক্তা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন বার্তা-সম্পাদকের এক প্রশ্নে— "আপনারা fossil নিয়ে টানাটানি করছেন কেন?"

সম্পাদক মহাশয় fossil বলিয়াছিলেন অশ্বিনীকুমারকে, না তাঁহার আদর্শকে, সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারি নাই। অশ্বিনীকুমারের আদর্শ ছিল সত্য প্রেম পবিত্রতা। মননে বচনে কর্মে সত্যনিষ্ঠা, ব্রাহ্মণচণ্ডাল নির্বিশেষে জনসেবা, আর কঠোর ইন্দ্রিয়-সংযম ছিল অশ্বিনীকুমারের আজীবন সাধনা। এই জীবনচর্যা যদি আধুনিক প্রগতিশীল সংস্কৃতিতে fossil-রূপে প্রতিপন্ন হয় আমাদের বলিবার কিছু নাই। আর যদি অশ্বিনীকুমারের ব্যক্তিত্বকেই সম্পাদকপ্রবর fossil আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে সমসাময়িক মনীষীদের মনোদর্পণে অশ্বিনীকুমার কোন্ রূপে প্রতিভাসিত হইতেন, তাহা সেযুগের বিখ্যাত বাগ্মী রাজনৈতিক নেতা বিপিনচন্দ্র পালের লেখা এই বইখানিতে প্রকাশ পাইবে। অশ্বিনীকুমারের চরিত্র আলোচনা-প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র বলিতেছেন, "আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মিগণের মধ্যে কেবল একজন মাত্র প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত। তাঁর মত এমন সত্য ও সাচ্চা লোকনায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্ম্মিগণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না।"

উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বিচারে বিপিনচন্দ্র পালও fossil হইয়া গিয়াছেন কিনা জানি না। সেযুগের রাজনারায়ণ বসু,

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, Stopford Brooke প্রভৃতি চিন্তানায়কেরাও কি এযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে fossil-এ পরিণত হইয়াছেন? কী জানি—তবে আমরা কিছু প্রত্নতত্ত্বই আলোচনা করি।

অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থ পাঠ করিয়া সেযুগের ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু অশ্বিনীকুমারকে লিখিয়াছিলেন, "এত রত্ন তোমার মনোভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। ঐ সকল গল্প স্মরণ করিয়া 'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ'। তুমি পরিশেষে এমন গ্রন্থ রচনা করিয়াছ যাহা মানববর্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিস্মৃতি-সাগরে লীন হইতে দিবেন না।" সে যুগের সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমি বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রতি দেখি নাই অথবা বাঙ্গালা ভাষায় অল্পই দেখিয়াছি।" সেযুগের মনস্বী সাহিত্যসাধক চন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করিয়াছিলেন, "বাঙ্গালায় যে একখানি খাঁটি জিনিষ হইল, ইহা বড় আনন্দের কথা।" সেযুগের সর্বজনশ্রদ্ধেয় জ্ঞানতপস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থকারকে জানাইয়াছিলেন, "আপনার পুস্তক পাঠে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবে।"

সেযুগের নমস্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যবিশারদ Rev. Stopford A. Brooke গ্রন্থপাঠে অভিভূত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন:

"Since I have read, I have been in another world than this noisy world of the West, where we spend our days in pursuing nothing which we think everything, and I have felt as if I could live otherwise. And in my old age I shall have time to assimilate, I

hope, a great deal of that which this book of yours ought to give to me. I am grateful to you for it."

এই তো গেল একদিকের চিত্র। অন্যান্য দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। কী দেখি? তৎকালীন ভারতের দণ্ডমুণ্ডকর্তা রাজপুরুষ অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে ভীত সন্ত্রস্ত; তৎকালীন সেবাপরায়ণা লোকমাতা অশ্বিনীকুমারের লোকহিতৈষণায় অভিভূত, গঠনপ্রতিভায় চমৎকৃত; তৎকালীন পরস্বাপহারী হিংস্র দস্যুশ্রেণী অশ্বিনীকুমারের নামমাহাত্ম্যে সম্মোহিত, আর্তত্রাণে নিয়োজিত।

বঙ্গভঙ্গের পর ভারতসচিব লর্ড মর্লি ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোকে এক চিঠিতে লিখিতেছেন—ভারতের তিনটি সমস্যার জন্য তিনি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন, প্রায় বিগতনিদ্র। সমস্যা তিনটি হইতেছে—সীমান্ত, সেনাবাহিনীর ব্যয় এবং বরিশাল। 'বরিশাল' শব্দের অর্থ—'বরিশালের অশ্বিনীকুমার-পরিচালিত সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধ গণ-আন্দোলন'।

১৯০৭ সালের Modern Review পত্রিকায় চার কিস্তিতে প্রকাশিত—'Glimpses of Famine and Flood in East Bengal in 1906' প্রবন্ধে বিবেকানন্দশিষ্যা রবীন্দ্রবন্দিতা 'লোকমাতা' Sister Nivedita লিখিয়াছিলেন—"Amongst voluntary organisations, unrecognised by State or Government, and taking place spontaneously in face of the need with which they were to deal, this, for rapidity of formation, loyalty to its leaders, cohesion and efficiency, might well, I think, claim to be unprecedented in any country.......It was a schoolmaster

and his students, then, who organised the relief of Backergunge. For Aswinikumar Dutt is nothing, after all, but the Barisal school-master."

১৯০৬ সালের দুর্ভিক্ষ-দূরীকরণে অশ্বিনীকুমার কী ভাবে দেশসেবা করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আছে ভগিনী নিবেদিতার উপরিলিখিত লাইন কয়টিতে। অন্নবস্ত্রহীন জনগণের হাহাকার-নিরাকরণে অশ্বিনীকুমারের স্বেচ্ছাবাহিনী যখন খাদ্যসম্ভার লইয়া গ্রামে গ্রামে ধাবমান, অনাহারক্লিষ্ট ক্ষুৎপীড়িত দুর্ধর্ষ দস্যুবাহিনী তখন দলে দলে জলে স্থলে যত্র তত্র লুণ্ঠন করিয়া স্ব স্ব জঠরানল নির্বাপণে ব্যাপৃত। এমনই এক ক্ষিপ্ত নৃশংস দস্যুদলের কবলে পড়িল অশ্বিনীকুমারের চাউলবাহী এক নৌকা। কিন্তু দস্যুরা যে-মুহূর্তে শুনিল ঐ নৌকা অশ্বিনীকুমারের, তাহাদের সমস্ত দুর্বৃত্তি অন্তর্হিত হইল; উপক্রমমাণ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহারা সেবাদলের অনুচর হইল, জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

অবিশ্বাস্য কাহিনী? স্বর্ণোজ্জ্বল এই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করেন কিয়ৎসংখ্যক এমন ব্যক্তি অদ্যাপি সশরীরে বর্তমান।

শ্রীহরেন্দ্রকুমার ঘোষ
সভাপতি, বরিশাল সেবাসমিতি

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত*

অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নবযুগের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট চরিত্রাভিনয় শেষ হইল। অশ্বিনীকুমারের অলৌকিক প্রতিভা ছিল, এমন বলা যায় না। তিনি আধুনিক বাংলার চিন্তা বা ভাবের অভিব্যক্তিতে কোনও নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছেন, কিম্বা তাহাতে অনন্যসাধারণ শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহাকে যতই ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি না কেন, তাঁহার পক্ষে এ দাবীও করিতে পারি না। মোটের উপরে এ সকল বিষয়ে অশ্বিনীকুমার একালের আর দশজন ইংরাজীশিক্ষিত লোকের মতনই ছিলেন। অথচ তাঁহার আড়ম্বরশূন্য জীবনে ও চরিত্রে এমন একটা-কিছু ছিল, যাহা তাঁহার সমসাময়িক ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে দেখা যায় নাই। আর এই একটা কিছুর উপরেই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে অশ্বিনীকুমারের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই একটা-কিছু অশ্বিনীবাবুর কর্ম্মযোগ। এই যুগে বাংলাদেশে অনেক কর্ম্মীই জন্মিয়াছেন। কেহ বা ধর্ম্মসংস্কারে, কেহ বা সমাজ-সংস্কার ব্রতে, কেহ বা রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকল্পে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহাদের কর্ম্মের দ্বারাই আধুনিক বাংলার সামাজিক জীবন গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে নানাদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইঁহাদিগকে যতই শ্রদ্ধাভক্তি করি না কেন, দু'একজন ছাড়া

*বঙ্গবাণী, পৌষ ১৩৩০

ইঁহাদের কাহাকেওই সত্য কর্ম্মযোগের সাধক বলিতে পারি না। এই সাধনা যে ভাবে অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আর কাহারও মধ্যে সেইভাবে প্রকাশিত হয় নাই।

(২)

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কর্ম্মযোগের তুইটি ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, এক জ্ঞানের ধারা, আর এক ভক্তির ধারা। জ্ঞানপথের কর্ম্মযোগের আদর্শ মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পরিচিত শ্লোকেতে দেখিতে পাই।

"ব্রহ্মনিষ্ঠঃ গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিবেন, এবং জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যাইয়া যখন যে কর্ম্ম করিবেন, তৎসমুদয় পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি এই কর্ম্মযোগের ভিত্তি।—এই কর্ম্মযোগের জ্ঞানপ্রধান। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্ম-জ্ঞানের সঙ্গে অনুস্যূত—'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্মময় জগৎ'—ইহাই ব্রহ্মানুভূতির শেষ কথা।

"স্থাবরজঙ্গম দেখে, দেখে না তার মূর্ত্তি,
যাঁহা নেত্র পড়ে হয় ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি।"

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে সাধকের এই অবস্থাই হয়। তখন সাধক আপনাকে বিশ্বময় দর্শন করেন। বেদে বামদেব ঋষি এই সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়াই কহিয়াছিলেন, আমি সূর্য্য, আমি মনু হইয়াছিলাম। এই জ্ঞান লাভ হইলে সাধকের চক্ষে জগৎ ও জীব সকলই ব্রহ্মময় হইয়া উঠে। তখন তাঁহার

"সর্ব্বজীবে হয় ব্রহ্ম ভাবোদয়
চিদানন্দ জেগে উঠে।"

এই চিদানন্দ রসে তাঁহার অন্তর্বাহ্য রসায়িত হইয়া সাধকের চিত্ত সমতালাভ করে। এই সমতাই ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের শেষ কথা। কর্ম্ম—এ পথে সিদ্ধির সহায় মাত্র। এ পথে সাধক কর্ম্মের দ্বারা দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন। প্রথমে বিবিধ ক্রিয়ার দ্বারা ধাতুর প্রসন্নতালাভ করিতে হয়। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ্ কহিয়াছেন যে সাধক 'ধাতু-প্রসাদাৎ' আত্মার মহিমা দর্শন করেন—

'ধাতুপ্রসাদাৎ মহিমানমাত্মানম্'

আমাদের শরীরের উপাদানগুলি যদি সমতালাভ না করে, তাহা হইলে স্নায়ুমণ্ডল স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে না। স্নায়ুমণ্ডলের স্থৈর্য্যলাভ ব্যতীত ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি হয় না। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নিবৃত্ত না হইলে চিত্ত স্থির হইতে পারে না, বিষয় বাসনা বিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। চিত্ত স্থির না হইলে ধ্যানের শক্তি জন্মে না। ধ্যানের শক্তি না জন্মিলে অনিত্যের মধ্যে যে নিত্যবস্তু নিয়ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই নিত্যবস্তুই ব্রহ্মবস্তু। এই ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, এই জন্যই, সকলের আগে দেহশুদ্ধির প্রয়োজন। দেহ শুদ্ধ হইলে ধাতুর প্রসন্নতালাভ হয়। ধাতুর প্রসন্নতালাভ হইলে চিত্তের সমতালাভ করা সহজ হইয়া উঠে। ধাতুর প্রসন্নতা লাভ হইলে পরে অর্থাৎ ভূত শুদ্ধিলাভ হইলে, স্বাধ্যায় অথবা সুশাস্ত্রের অধ্যয়ন, ইষ্টনাম জপ, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হয়। এই রূপে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধিলাভ হইলে পরে সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান-অনুশীলনের যোগ্যতা জন্মে। তখন ব্রহ্ম-

প্রতিপাদক বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলনের দ্বারা সাধকের সত্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইয়া

'যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।'

যাহা যাহা কর্ম্ম করেন, তাহাই ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন। ইহাই জ্ঞানপথের কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগ শান্ত-উপাসনার অন্তর্গত। ইহাও নিষ্কাম কর্ম্মই বটে। তবে এই কর্ম্মযোগে নিষ্ঠা আছে, কিন্তু উচ্ছ্বাস থাকিতে পারে না। এ পথে সাধক কতকটা যেন যন্ত্রারূঢ়ের মতন কর্ম্ম করিয়া যান। এ অবস্থা লাভ করিলে কর্ম্ম করিলেও পুণ্য হয় না, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। কারণ এই অবস্থালাভ হইলে সাধক পাপপুণ্যের অতীত হইয়া যান।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীনাং।
তদাপুণ্যে পাপে বিধূয় নিরঞ্জনং শান্তমুপৈতি।"

দ্রষ্টা যখন রুক্মবর্ণ ঈশ্বরকেই একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া প্রত্যক্ষ করেন, তখন পাপপুণ্যের অতীত হইয়া নিরঞ্জন শান্তিলাভ করেন। ইহাই শান্ত-উপাসনার সিদ্ধি। ইহাই জ্ঞানপথে কর্ম্মযোগের শেষ কথা।

(৩)

অশ্বিনীকুমার যে কর্ম্মযোগের পথের পথিক ছিলেন, তাহা এই জ্ঞানপথের যোগ নহে। অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মযোগ তাঁহার ভক্তিসাধনের অন্তর্গত ছিল। আর তাঁহার ভক্তিও মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী ভক্তিপন্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অনর্পিতচরী ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী নহে; কিন্তু গুরুশাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি, সত্য ব্রহ্মজ্ঞান সাধন না হইলে মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত এই অনর্পিতচরী ভক্তিসাধনের

অধিকারই জন্মে না। ভগবল্লীলার অনুশীলন মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ভক্তি-পন্থার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যতীত কেহ এই রাগানুগা ভক্তির পথে প্রবেশ করিবার অধিকার পান না। রস এই রাগানুগা ভক্তির প্রাণস্বরূপ। ভগবানের রসলীলাই রাগানুগা ভক্তির-উপজীব্য। নিকৃষ্ট লোকেরা এই রসলীলার একটা অপকৃষ্ট অর্থ করিয়া লইয়া থাকে। রসের সঙ্গে ইন্দ্রিয়লালসাবিবর্জ্জিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির একটা অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এই সূক্ষ্ম সম্বন্ধটি ধরিতে না পারিলে আমাদের প্রচীন সাধনাতে যাহাতে রস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে বস্তু যে কি, ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। এই রসতত্ত্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়া, এই জন্যই বাংলার বৈষ্ণব পন্থার রসশাস্ত্র 'উজ্জ্বলনীলমণি' সর্ব্বপ্রথমেই কহিয়াছেন—

'নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিকারঃ'

চিত্তের নির্ব্বিকার অবস্থাপ্রাপ্তি হইলে পরে তাহাতে যে প্রথম বিকার সঞ্চার হয়, তাহাকেই ভাব বা রস কহে। নির্ব্বিকার চিত্তের লক্ষণ এই যে ইন্দ্রিয়ের ভোগের বিষয় বিদ্যমানেও তখন ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। তখন ভোগ্যবিষয়ের সাক্ষাৎকারেও এই ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য নিবন্ধন চিত্তের সমতা নষ্ট হয় না। তখন এই ইন্দ্রিয়বিকারশূন্য চিত্তে প্রথম যে চিদানন্দ-তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করে, তারই নাম ভাব বা রস। এই চিদানন্দ-তরঙ্গ বা বিকারকে সাত্ত্বিকী বিকার কহিয়াছেন। এই সাত্ত্বিকী বিকারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিকারের বাহ্য লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। ইন্দ্রিয়-বিকারের স্বেদ, কম্প, পুলকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে ; কিন্তু ইহার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যও বিদ্যমান রহে। সাত্ত্বিকী বিকারেও স্বেদ, কম্প, পুলকাদি প্রকট হয় ; কিন্তু তাহার সঙ্গে কোনও

প্রকারের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য মিশিয়া থাকে না। কথাটা বুঝান কঠিন। যাঁহাদের এ বস্তুর আদৌ কোনও অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদিগকে এই ইন্দ্রিয়বিকারবিরহিত স্নায়বীয় বিকারের ও অপূর্ব্ব দৈহিক উল্লাসের কথা বুঝান অসম্ভব। ভাগ্যবানে কখনও কখনও বয়োবৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই রসবস্তু যে কি তাহার ইঙ্গিত পাইয়া থাকেন। পুত্র-কন্যা বড় হইয়া উঠিলে তাহাদের দাম্পত্যলীলা দেখিয়া পিতা-মাতার অন্তরে যে অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মিয়া থাকে, তাহার দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ব্বিকার চিত্তের সাত্ত্বিকী বিকারের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজীতে এই সম্ভোগকে 'ভাইকেরিয়াস'—(Vicarious) বিশেষণ দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরাজীতে সে সত্যকে 'ভাইকেরিয়াস' (Vicarious) বলা হয়, আমাদিগের সাধনায় তাহাকেই সত্যভাবে পরকীয়া রস কহিতে পারা যায়। এই পরকীয়া রস সর্ব্বপ্রকারের ইন্দ্রিয় সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত। এমন কি, ইন্দ্রিয়সম্পর্কের কল্পনাস্পর্শেও এই রস নষ্ট হইয়া যায়। এই যে নির্ব্বিকার চিত্তের চিদ্বিকার ইহাই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী ভক্তিপন্থার প্রাণ। এই কথাটি না বুঝিলে বাংলার ভক্তিপন্থার মর্ম্ম বুঝা অসম্ভব।

(৪)

এই ভক্তিপন্থা ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই রাগানুগা ভক্তির প্রথম সোপান শান্তভাব বা শান্তি রস। সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টিলাভ হইলেই কেবল এই শান্তভাবের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। শান্ত সাধনা সাধকের চিত্তপটকে একরঙ্গা করিয়া দেয়। কোনও চিত্রপটে বিচিত্র ছবি আঁকিতে হইলেই সেই পটখানিকে যেমন একরঙ্গা করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ সাধকের চিত্তপটে বিচিত্র রসলীলা

ফুটাইতে হইলে সেই চিত্তকে আগে সমভাবাপন্ন করা আবশ্যক। চিত্তের এই অবস্থাকেই 'উজ্জ্বলনীলমণি' নির্ব্বিকারাত্মকাবস্থা কহিয়াছেন। চিত্তের এই সমতাকে লক্ষ্য করিয়াই।

'নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিকারঃ'

ভাবের বা রসের এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর কহিয়াছি যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অর্থাৎ আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ না হইলে চিত্তের সমতা লাভ হয় না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যতীত ভগবল্লীলারস অনুশীলনের অধিকারী কেহ হইতে পারে না, এই জন্যই গুরুশাস্ত্রমুখে এই কথাই শুনিয়াছি।

(৫)

মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী ভক্তিপথে যে কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা এই লীলাতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই রসমার্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারিটি রস ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি পুত্রাদির যে ভক্তি, তাহা যখন রসের পর্য্যায়ে যাইয়া উঠে, তখনই দাস্য রসের প্রকাশ হয়। সাধারণ প্রভুভক্তি বা গুরুভক্তিকে দাস্য রস কহা যায় না। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞাপালন করিলেই কিংবা প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিলেও এই গুরুভক্তি দাস্যরস হয় না। নিঃশেষে আত্মবিলোপ রসের প্রথম লক্ষণ। পিতার ইচ্ছার সঙ্গে পুত্রের ইচ্ছা যখন নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যায়, পিতা যাহা চাহেন তাহার অতিরিক্ত কোনও কামনা যখন পুত্রের থাকে না তখনই পিতৃভক্তি দাস্যরসের সোপানে অধিরোহণ করে। ঈশা চরিত্র ও খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত ভক্তি পন্থা এই দাস্য রসের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। মাতৃভক্তি এবং গুরুভক্তি সম্বন্ধেও এই কথাই

সত্য। আর পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনেতে দেববুদ্ধি বা ব্রহ্মবুদ্ধি লাভ না হইলে মানুষ কখনওই তাঁহাদের সঙ্গে এই গভীর একাত্মতা লাভ করিতে পারে না। পিতামাতা গুরুজন সম্বন্ধে সামান্য মানুষ বুদ্ধি লোপ না পাইলে দাস্যরস আস্বাদনে অধিকার জন্মে না। এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান অথবা সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান রাগানুগা ভক্তিমার্গের পূর্ব্ববৃত্তসাধন।

(৬)

ভূত-শুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে যেমন সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অসাধ্য, সেইরূপ সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচারী রাগানুগা ভক্তিসাধন অসাধ্য। আর এই ভক্তিপথ ব্যতিরেকে ভাগবতী লীলামার্গে কর্ম্মযোগের অনুশীলনও অসাধ্য। ভক্তিপথে যে কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকে এই ভাগবতী লীলাপথ আশ্রয় করিতেই হয়। এই পথের প্রবর্ত্তক দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি। আজি কালি আমরা যাহাকে ইংরাজীতে ethical life বলি, অর্থাৎ যে সাধনের দ্বারা চরিত্রের বিশুদ্ধতা লাভ হয়, ইন্দ্রিয় লালসাদি সংযত হইয়া যায়, তাহাই আমাদের প্রাচীন সাধনার দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির উপায়। সত্যরক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য্য বা শুক্রধারণ এই দেহশুদ্ধি ও চিত্ত-শুদ্ধির মূল প্রতিষ্ঠা। সত্যরক্ষা এবং শুক্রধারণের উপরেই আমরা আজি কালি যাহাতে বিশুদ্ধচরিত্র বলি তাহারও প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্যই বিশুদ্ধ চরিত্রলাভ এবং ভূতশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি একই কথা। এখানে প্রাচীন এবং আধুনিক সাধনপথ পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এই কর্ম্মযোগের পথের সাধক ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মানুষে মনুষ্য-বুদ্ধি থাকে না। তখনই সাধক

"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্
পরমভাবমজানন্তো মমভূতো মহেশ্বরঃ— "

ভূত মহেশ্বর যে আমি, আমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যে কি ইহা ধরিতে না পারিয়া অজ্ঞানিগণ আমার মানুষীরূপকে অবজ্ঞা করে—ভগবদ্গীতার এই মহাবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই কেবল

"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ"

মহাপ্রভুর ভক্তি সিদ্ধান্তের এই মূল তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম যে কি ইহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়, এই জন্যই এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে চিরদিন আমাদের দেশে ভক্তিপন্থায় সত্য কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মযোগ এই পথেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মজীবনে প্রাচীন সাধনার সঙ্গে আধুনিক আদর্শের একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় চেষ্টা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভক্তি-যোগ এবং কর্ম্মযোগের চাবীকাটি দিয়াই অশ্বিনীকুমারের চরিত্রের এবং জীবনের মণিকৌটার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে হয়।

(৭)

কিন্তু অশ্বিনীকুমার কেবল প্রাচীন পন্থারই অনুসরণ করিয়াছিলেন, এমন কথাও বলা যায় না। তিনি যে যুগে জন্মিয়াছিলেন, বাল্যে এবং যৌবনে যে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, যে আধার এবং আবেষ্টনের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন ও চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার পক্ষে অবিচারিত ভাবে প্রাচীনের অনুবর্ত্তন সম্ভব ছিল না। যুগ-প্রভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বিনীকুমার গতানুগতিক পন্থা আশ্রয়

করেন নাই। প্রথম যৌবনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সেকালের ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার উপরেই অশ্বিনীকুমারের চরিত্রের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। এককালে অশ্বিনীকুমারের বন্ধুরা ভাবিয়াছিলেন যে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া লইবেন, এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যাইবেন। তাঁহাদের এই আশা বা আশঙ্কা ফলিয়া উঠে নাই। অশ্বিনীকুমার পিতার আদেশে হিন্দু-সমাজে হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে দার পরিগ্রহ করেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও অশ্বিনীকুমার কোনও দিন প্রথম যৌবনের ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে বর্জ্জন করেন নাই। সেকালের ব্রাহ্ম চরিত্রের দুইটি প্রধান লক্ষণ ছিল ; এক,—সত্যনিষ্ঠা, আর এক,—ইন্দ্রিয়সংযম। এই দুই বিষয়ে অশ্বিনীকুবার চিরদিন খাঁটি ছিলেন। ফলতঃ প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে আমরা যে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির কথা শুনিতে পাই, আধুনিক ব্রাহ্ম সমাজে এই ইন্দ্রিয়-সংযম বা বীর্য্যধারণ এবং সত্যনিষ্ঠার দ্বারা সেই সাধনাই লাভ হইত। ফলতঃ প্রাচীন সাধনাতেও ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণের দ্বারাই দেহশুদ্ধি লাভ হইত। সাধককে শুক্রধারণক্ষম করিবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের যাবতীয় আচারবিচারের খুঁটিনাটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

"বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ
যানি দ্রব্যানি সুক্তানি সর্ব্বপ্রাণিহিংসনঞ্চ—"

মদ্য, মাংস, সুগন্ধ দ্রব্য, পুষ্পমালাদি, রসাল খাদ্য, স্ত্রীসংসর্গ, যে সকল খাদ্যদ্রব্য পূর্ব্বদিন পাক হইয়া পরদিন পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছে ; আর সকল প্রাণীর হিংসা বর্জ্জন করিবে—এই সকল প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের

বিধান ব্রহ্মচারীকে সংযতেন্দ্রিয় করিয়া তাঁহার ধাতুর প্রসন্নতা সাধন করিবার জন্যই বিহিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে নূতন ইংরাজী শিখিয়া আমরা যতটা সরাসরিভাবে এ সকল আচারবিচারের ব্যবস্থাকে কুসংস্কারমাত্র বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম, আজ সেভাবে বর্জ্জন করা সম্ভব নহে। সংযতেন্দ্রিয় হওয়া কতটা পরিমাণে যে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলের স্বাস্থ্য, শক্তি এবং স্থৈর্য্যের উপর নির্ভর করে, আধুনিক শরীর-বিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বও ইহা ক্রমে ক্রমে ধরিতে পারিতেছে। খাদ্যাখাদ্য বিচারের উপরে দেহশুদ্ধি নির্ভর করে। আর দেহকে সাধনের অনুকূল করিবার জন্য এ সকল বিচার অগ্রাহ্য করা যায় না। ইহা আজিকালিকার যুক্তিবাদও অস্বীকার করিতে পারে না। এই দেহশুদ্ধির সঙ্গে চিত্তশুদ্ধিও অতিশয় ঘনিষ্টভাবে জড়াইয়া আছে। অশুদ্ধ দেহে অর্থাৎ যে দেহ সংযমসাধনের অনুকূল নহে, তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তের সমতালাভ করা, অর্থাৎ বিষয়-বাসনার গতিবেগ সংযত করা সম্ভব হয় না। এ সকল কথা এখন সকলেই স্বল্পবিস্তর স্বীকার করিতেছেন। এইরূপে আমাদের দেশের প্রাচীন সাধনে দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির প্রয়োজন আধুনিকেরাও আর অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কোনও না কোনও আকারে এই সকল সাধন অবলম্বন করিতেই হইবে।

(৮)

ফলতঃ পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও এই সকল প্রাচীন পরিভাষা ব্যবহৃত না হইলেও বহুল পরিমাণে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির মূল সাধন অবলম্বিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার যখন

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করেন, তখন ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনে একদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির এবং অন্যদিকে পুরুষানুক্রমাগত বৈষ্ণব সংস্কারের প্রভাবে কঠোর বৈরাগ্য সাধন করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়স হইতেই নিরামিষাশী হইয়া 'সর্ব্ব-প্রাণীহিংসনঞ্চ' বর্জ্জন করিয়াছিলেন। মদ্যপান সেকালের ইংরাজী-শিক্ষিতদিগের মধ্যে বহুল প্রচলিত থাকিলেও কেশবচন্দ্র কখনও তাহা স্পর্শ করেন নাই। প্রথম যৌবনে গন্ধমাল্যাদি ভোগবিলাসও বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। কেশবচন্দ্রের প্রভাবে সেকালের ব্রাহ্ম-সমাজেও এই সকল সংযম অবলম্বিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্ম যুবকেরা অনেকেই মনুকে অন্যান্য বিষয়ে সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া বর্জ্জন করিলেও মনুপ্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যের বিধানগুলি আপনাদের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে আসিয়া পড়েন, তখন ব্রাহ্মেরা সর্ব্বতোভাবে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য একদিকে মনুর ব্রহ্মচর্য্যের বিধানগুলি কার্য্যতঃ মানিয়া চলিতেন, এবং অন্যদিকে কায়মনোবাক্যে সত্যরক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। এই সত্য-নিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য্য আমরণ তাঁহার জীবনে, আচরণে এবং চরিত্রে অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহারই উপরে তাঁহার কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যরক্ষার দ্বারা সমদমাদি সাধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া অশ্বিনীকুমার সত্য ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে অধিকার লাভ করেন। যদিও প্রথমযৌবনে অশ্বিনীকুমার বেদান্তাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের

আচার্য্যদিগের উপদেশাদিতে অনেক পরিমাণে অজ্ঞাতসারে তিনি বেদান্ত-বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্ত ও মতবাদ যদিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে শঙ্করবেদান্তের সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিয়াছিল, তথাপি কোনও কোনও দিক দিয়া দেখিলে তাহা উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকেই আশ্রয় করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও উপনিষদ্‌কে বর্জ্জন করে নাই, কিন্তু তাহারই সঙ্গে খৃষ্টিয়ান একেশ্বরবাদকে মিলাইয়া লইয়াছিল। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই নিজেদের ধর্ম্মতত্ত্বে এবং ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে আমাদিগের প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্বকে মিলাইয়া লইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র শেষ জীবনে ইহার সঙ্গে ভগবদ্‌-তত্ত্বকেও মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে সেকালের ব্রাহ্মসমাজে সত্যই ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের একটা চেষ্টা হইয়াছিল। আর ব্রাহ্মসমাজের এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেই অশ্বিনীকুমারের ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেই প্রথমে তাঁহার ভক্তি-যোগের, এবং এই ভক্তিযোগের উপরে ক্রমে তাঁহার কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই রূপেই অশ্বিনীকুমারের জীবনের কর্ম্মপথে জ্ঞান এবং ভক্তিযোগের মিলন হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনের অভিব্যক্তির ইতিহাসে প্রথমে ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শে বিশুদ্ধ চরিত্র গঠনের চেষ্টা দেখিতে পাই। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে তাঁহার অন্তর্নিহিত আস্তিক্যবুদ্ধির উপরে ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের প্রয়াসও প্রত্যক্ষ করি। ব্রাহ্মসমাজের এই ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান কেবল শুষ্ক-জ্ঞান ছিল না। মহর্ষির ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে মহম্মদীয় সাধকদিগের সখ্যভক্তি নিগূঢ়ভাবে মিশ্রিত ছিল।

কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রথমে খৃষ্টিয়ান সাধকদিগের দাস্যভক্তি, এবং পরে আংশিকভাবে বৈষ্ণব সাধনার রাগানুগা ভক্তির ছায়াও মিশিয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের সাধনভজন আশ্রয় করিয়া প্রথম যৌবনে অশ্বিনীকুমার এই ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানপন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার অন্তর্জীবনের এবং ধর্ম্মজীবনের বিকাশ থামিয়া যায় নাই। ক্রমে সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিয়া তিনি এই জ্ঞান এবং ভক্তির পথে আরও বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সদ্‌গুরু লাভের পরে অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবন নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে এবং উত্তরোত্তর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আধুনিক যুক্তিবাদ গুরুকরণকে কুসংস্কার বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছে। ইহাতে যুক্তিবাদের কোনওই দোষও নাই, কারণ সচরাচর যে ভাবে এ দেশের লোকেরা গুরু বলিয়া থাকেন, তাহাতে ভক্তিসাধনে গুরুর সত্য স্থান যে কি, ইহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক সময় এই গুরুকরণ এবং গুরুশক্তি একটা অতিপ্রাকৃত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার এবং বস্তু বলিয়াই মনে হয়। এই গুরুকরণের যে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, ইহা ধরা অসম্ভব হয়। এই গুরুকরণের দার্শনিক তত্ত্বটাও বুঝা যায় না। এই জন্য যাঁহারা এ সকল বিষয়ে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গুরুবাদের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের দেশের ভক্তিসাধনে, বিশেষতঃ মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ভক্তিপন্থাতে সদ্‌গুরুর যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিতান্ত যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। ইহার একটা বোধগম্য দার্শনিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। ভাগবত পরমতত্ত্ব ভগবানকেই একমাত্র গুরুরূপে

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আধুনিক যুক্তিবাদ যাহাকে মানুষ-গুরু বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহে, ভাগবতের গুরু এই জাতীয় নহেন। ভাগবত-সিদ্ধান্তে গুরুকে মানুষ জ্ঞান করা অপরাধ কহিয়াছেন। মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে গুরুকে অবজ্ঞা করিবে না ; স্বয়ং ভগবানকেই গুরু বলিয়া জানিবে—ইহাই ভাগবতের অনুশাসন। ইহার অর্থ এই নহে যে গুরুতে ভগবদ্-অধিষ্ঠান আরোপ করিয়া গুরুর ভজনা করিবে। এইরূপ আরোপকে আমাদের শাস্ত্রে 'অধ্যাস' কহিয়াছেন। 'অন্যত্রদৃষ্টঃ পরত্রাভাসঃ'—ভগবান্ ভাষ্যকার অধ্যাসের এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, একস্থানে যাহা দেখা গিয়াছে, অন্যত্র যেখানে তাহা তখন বিদ্যমান নাই, সেখানে তাহার আরোপ করার নামই 'অধ্যাস'। জঙ্গলে সাপ দেখা গিয়াছে ;-ঘরের পৈঠায় সত্য সাপ নাই, এক গাছা দড়ি পড়িয়া আছে ; এই দড়িতে সর্পজ্ঞান আরোপ করাই 'অধ্যাস'। যে মানুষের মধ্যে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ নহে, তাঁহাতে ভগবত্ত্ব আরোপ করিলে ইহা 'অধ্যাস' হয়। যে গুরুতে ভগবানের প্রকাশ ফুটিয়া উঠে নাই, অর্থাৎ, যাঁহাকে দেখিবামাত্র সাধকের অন্তর্নিহিত নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভাব জাগিয়া না উঠে, তাঁহার মধ্যে ভগবান্ আছেন, এইরূপ কল্পনা করিলে ইহা 'অধ্যাস' হয়। সদ্গুরুতত্ত্ব বুঝিতে হইলে আগে এই কথাটা বুঝিতে হইবে। সদ্গুরু তিনি যাঁহার মধ্যে ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রকট হয়েন ; যাঁহাকে দেখিলে 'ইহার মধ্যে ভগবান্ আছেন', চক্ষু বুজিয়া এই কল্পনা করিতে হয় না, কিন্তু স্বতঃই অন্তরে ভগবদ্বুদ্ধি জাগিয়া উঠে, কেবল তিনিই সদ্গুরু হইতে পারেন। যেখানে গুরুতে ভগবদ্-সত্তা আরোপ করিতে হয়, সেই গুরুতে আর শালগ্রাম শিলাতে কিম্বা অন্য কোনও প্রতীকে কোনও প্রভেদ থাকে না। সদ্গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধিতে

অবজ্ঞা করিবে না , ভগবতের এই অনুশাসনের অর্থ এ নয় যে, সাধক জোর করিয়া এই মনুষ্যবুদ্ধিকে চাপিয়া রাখিবেন, কিন্তু এই মনুষ্যবুদ্ধি আপনা হইতেই জাগিবে না।

ভাগবত একমাত্র পরমতত্ত্ব ভগবানকেই গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভগবানের এই গুরুশক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ হয়। এক সাধকের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে, অপর বাহিরে সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে। যে সাধক সাধন বলে ভগবদ্‌কৃপায় আপনার অন্তর্নিহিত ভাগবতী শক্তিকে জাগাইয়া সেই শক্তির নিকটে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গে একাত্ম হইয়া ভাগবতী তনু লাভ করেন, তাঁহার সকল চেষ্টা, সকল কর্ম্ম, সকল ভাব ভগবদ্‌প্রেরণাতে অনুষ্ঠিত ও স্ফুরিত হয়, তাঁহার নিজের বলিতে কিছুই থাকে না, সেই সাধকই আপনার মধ্যে ভগবানকে প্রকট করিয়া তুলেন। তাঁহার মধ্যে ভগবানের সত্তা আরোপ করিতে হয় না, প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সিদ্ধি যাঁর লাভ হইয়াছে, তিনিই কেবল সদ্‌গুরুপদবাচ্য হয়েন। এই সদ্‌গুরুসাক্ষাৎকার যাঁর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কেবল তিনিই আমাদের সাধনার ভক্তিপন্থায় যে গুরুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। এই সদ্‌গুরুতত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের মূল প্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের জ্ঞানের দুই অঙ্গ, এক অন্তরঙ্গ অপর বহিরঙ্গ। আমাদের অন্তরে বস্তুজ্ঞানলাভের জন্য কতকগুলি জ্ঞানের ছাঁচ আছে, এরূপ বলিতে পারা যায়। এই অন্তরের জ্ঞানের ছাঁচগুলিকেই আমাদের প্রচলিত প্রবাদবাক্যে ‘ভাণ্ড’ কহিয়াছে। ‘যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে’—এখানে ভাণ্ড শব্দের ইহাই প্রকৃত অর্থ। এই ভাণ্ডকেই ইংরেজী দর্শনে intution কহে। ইহাকেই মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্বে আত্মপ্রত্যয় কহিয়াছেন। আমাদের অন্তরের ভাণ্ড বা জ্ঞানের ছাঁচগুলি বা intution or আত্ম-প্রত্যয় বস্তুর বহিঃসাক্ষাৎকার ব্যতীত সচেতন বা কার্য্যক্ষম হয় না। বাহিরের বস্তুসাক্ষাৎকারেই কেবল ভিতরের এই জ্ঞানের ছাঁচগুলি পরিপূর্ণ হইয়া একদিকে নিজেদের প্রকৃতি এবং আকার, এবং অন্যদিকে বাহিরের বস্তুজ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং 'যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে', ইহাতে সত্যের এক দেশ মাত্র প্রকাশিত করে। এই কথাটা যেমন সত্য, 'যাহা দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা জাগে না ভাণ্ডে', এই কথাটাও সেইরূপই সত্য। কেবল ভাণ্ডের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না, কেবল ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারাও হয় না। ভাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড উভয়ের যোগেতেই জ্ঞান সম্ভব হয়। আত্মপ্রত্যয় এবং বস্তু সাক্ষাৎকার উভয়ই জ্ঞানলাভের জন্য সমান প্রয়োজনীয়।

ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্-জ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। অন্তর্নিহিত নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্-জ্ঞান বাহিরে ব্রহ্মসত্তার বা ভগবদ্-সত্তার প্রকাশ ব্যতিরেকে কখনও জন্মে না, জন্মিতেই পারে না। যতক্ষণ না বাহিরে ব্রহ্মপ্রকাশ বা ভগবদ্-প্রকাশ হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সত্য ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্-জ্ঞানলাভ অসম্ভব। আর আমাদের জ্ঞানের এই মূল প্রকৃতির উপরেই আমাদের ভক্তিপন্থায় সত্য সদ্‌গুরুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্মযোগসাধনে এই জন্যই সদ্‌গুরুলাভ একটা বিশেষ ঘটনা।

অশ্বিনীকুমারের পরম সৌভাগ্যে পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে সদ্‌গুরুরূপে পাইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় এই যুগের মানুষ ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে চিন্তা এবং সাধনার সঙ্গে গোস্বামী

মহাশয় আমাদের দেশের সনাতন সাধনার একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়া এই সমন্বয়ের উপরেই নিজের ধর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ের উপরেই তাঁহার অলোকসামান্য সিদ্ধির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয়ের শিক্ষাদীক্ষা এবং গুরুশক্তিপ্রভাবেই অশ্বিনীকুমারের ধর্ম্মজীবন এবং কর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। অশ্বিনী-কুমারকে বুঝিতে হইলে তাঁহার গুরুকে ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন।

গোস্বামী মহাশয়ও অশ্বিনীকুমারের মতন ব্রাহ্মসমাজেরই লোক ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজের সাধনপথেও যে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিলাভ এবং এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী ভক্তিপথে সিদ্ধিলাভ সম্ভব, গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে এবং চরিত্রে এই কথাটাই প্রমাণ হইয়াছে। সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত না হইতে পারিলে সত্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে না। পুরুষানু-ক্রমাগত সংস্কার এবং গতানুগতিক ধর্ম্মের অনুসরণ মানুষকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে দেয় না। এ পথে মানুষ কলের পুতুলের মতন নির্দ্দিষ্ট আচার-বিচার মানিয়া চলে। এ সকল আচার-বিচার প্রতিপালনে তাহার ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় না। প্রচলিতে সন্দেহ উপস্থিত না হইলে জিজ্ঞাসা জাগে না। জিজ্ঞাসা না জাগিলে বিচারের প্রেরণা জাগে না। বিচার ব্যতিরেকে কোনও সত্যই সাধকের অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অনুভবে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। এই জন্যই আমাদের প্রাচীনেরা 'অনুভূতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং', জ্ঞানের এই সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। সংস্কার মাত্রেই তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, মানুষের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। সংস্কার যত বদ্ধমূল হয়, ততই তাহা প্রকৃত জ্ঞানলাভের

অন্তরায় হইয়া থাকে। সংস্কারবদ্ধ গতানুগতিক ধর্ম্মে নিষ্ঠা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধিলাভ হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। এই জন্যই জ্ঞানসাধনে প্রথম কথা সর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জন। সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জন করিয়া মনোদর্পণ নির্ম্মল হইলেও তাহার উপরে সত্যের স্বরূপ প্রতিভাত হয়। ইহাই সাধনপথে সংস্কার-বর্জ্জনের প্রয়োজন।

গোস্বামী মহাশয় শ্রীমন্ অদ্বৈত আচার্য্যের বংশে পরমভাগবত বৈষ্ণবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পৈতৃক সংস্কারে আবদ্ধ হন নাই। প্রথম যৌবনে পৈতৃক ব্যবসায় করিতে করিতেই তাঁহার ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। নিজে অসিদ্ধ থাকিয়া অপরকে সাধনপথে পরিচালিত করা অসাধ্য ইহা বুঝিয়াই গোস্বামী মহাশয় পৈতৃক গুরুগিরি ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। বেদান্ত পড়িয়া প্রচলিত দেবোপাসনায় তাঁহার অনাস্থা জন্মে। ক্রমে শঙ্করবেদান্ত সিদ্ধান্তে অতৃপ্ত হইয়া মৌখিক ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তি দেয় না, দিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া গোস্বামী মহাশয় ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী উপদেশে ও ঈশ্বরভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার চিত্তকে ব্রাহ্মসমাজের সাধনপথে প্রবর্ত্তিত করে। নিষ্ঠাসহকারে এই নূতন সাধন অবলম্বন করিয়া গোস্বামী মহাশয় ক্রমে শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি-লাভে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে অধিকারী হয়েন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে লইয়া যায়। কেশবচন্দ্রের ভাব ও ভক্তিপ্রবণ উপাসনাদি ক্রমে ক্রমে গোস্বামী মহাশয়ের অন্তরে বিশুদ্ধা বৈধী ভক্তি প্রতিষ্ঠা করে। এখানেই তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ

থামিয়া যায় নাই। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা এবং ধর্ম্মপিপাসা তাঁহাকে চারিদিকে সত্য এবং ভগবানের অন্বেষণে ছুটাইয়া লইয়া যায়। ক্রমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের নামযপ এবং রাজযোগ সাধন করিতে আরম্ভ করেন। প্রাণায়ামাদি এবং এই নূতন ভক্তিযোগ সাধনের দ্বারা তাঁহার পরিপূর্ণ দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে গুরুশক্তি-সঞ্চারে ব্রহ্মদর্শন বা অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয়। তখন তাঁহার জীবনে ও চরিত্রে—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষিয়ন্তে চাঽস্যকর্ম্মাণি তস্মিনদৃষ্টে পরাবরে।'

এই শ্রুতিবাক্য ফলিয়া উঠে। তখন হইতে তাঁহার সকল আত্ম-সুখকামনা নিঃশেষে নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভে তাঁহার চিত্তের যাবতীয় সংশয় নিঃশেষে দূরীভূত হয়। কর্ম্মফললাভের লালসা হইতে যে কর্ম্মবন্ধনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সে কর্ম্ম নিশ্চিহ্ন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন হইতে গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ করিয়া অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ দ্বন্দ্বাতীত লইয়া সত্য ভক্তির বনিয়াদ শান্তভাবেতে অচ্যুত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই অবস্থা লাভ হইলে পরে তাঁহার চক্ষে আর জীব, জীব রহিল না, শিবরূপে ফুটিয়া উঠিল। মানুষ, মানুষ রহিল না, ব্রহ্মপ্রকাশরূপে ফুটিয়া উঠিল। তখন গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে

'স্থাবর জঙ্গম দেখে দেখে না তার মূর্ত্তি
যাঁহা নেত্র পড়ে হয় ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি—'

এই তত্ত্বটা প্রকাশিত ও স্বপ্রমাণ হইল। নরের মধ্যে নারায়ণ প্রকট হইয়া উঠিলেন। এই যে অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি, ইহারই উপরে

গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে ও চরিত্রে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী রাগানুগা ভক্তির মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই ভক্তিপথেই তিনি আমাদিগের প্রাচীন মহাজনসিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া মহাজন পন্থা অনুসরণে ভগবল্লীলার সম্ভোগ ও অনুবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপেই গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সাধনপথেই ক্রমে ক্রমে অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়া এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেই ভাগবতী লীলাতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত রাগানুগা ভক্তিসাধনে অলোকসামান্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধিবলেই ভাগবতী তনু পাইয়া গোস্বামী মহাশয় সত্য সদ্‌গুরুর আসন লাভ করেন।

গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সাধনকে এবং সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিয়া তাহার বিপরীত কোনও সাধন বা সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেন নাই; কিন্তু স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথে এই সাধনকে ক্রমে অতিক্রম করিয়া ইহারই পরপর স্বাভাবিক বিকাশসোপানে অধিরোহণ করিয়া শেষে চরম সিদ্ধিলাভ করেন; এই কথাটা না বুঝিলে গোস্বামী মহাশয়ের সাধনসূত্র এবং সিদ্ধির স্বরূপ বুঝা যাইবে না। আর এইটি না বুঝিলে গোস্বামী মহাশয় কিরূপে বিশেষভাবে আমাদের এই যুগের মানুষ হইয়াছিলেন, এই সত্যটাও বুঝা যাইবে না।

অশ্বিনীকুমারও ব্রাহ্মসমাজের সাধনপথে চলিয়াই ক্রমে তাঁহার ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগের পথে প্রবেশ করেন। ব্রাহ্মসমাজের সাধনের দ্বারা অনেকটা দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াই তিনি গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয় লাভ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের সাধনে অতিপ্রাকৃত অথবা ব্রাহ্মসমাজের সাধনের বিরোধী কোনও কিছু ছিল না। গোস্বামী মহাশয় আমাদের দেশের প্রাচীন সদ্‌গুরুদিগের

পন্থা অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন দীক্ষার্থীদিগকে তাঁহাদের ভিতরের প্রকৃতি অনুযায়ী ইষ্টনাম দান করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে তিনি ব্রহ্মনামই দিতেন। আমার বোধহয় অশ্বিনীকুমারকেও এই ব্রহ্মনামই দিয়াছিলেন। এই নাম যপ গোস্বামী মহাশয়ের সাধনের মুখ্য কথা ছিল। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নামযপ করিবে—তাঁহার এই উপদেশ ছিল। তিনি প্রত্যেক সাধককে তাঁহার ইষ্টমন্ত্র দিবার সময়ে নামের অর্থটি বুঝাইয়া দিতেন; এবং এই অর্থকে ধ্যান করিয়া নামযশ করিতে হইবে ইহা বলিয়া দিতেন। ক্লীং হ্রীং প্রভৃতি বৈদিক বা তান্ত্রিক বীজের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্রের কোনও যোগ ছিল না। একমাত্র ব্রহ্মপ্রতিপাদক ওঁকারের অথবা প্রণবের সঙ্গে তাঁহার প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র যুক্ত থাকিত। এই ওঁ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় যাহা হইতে সেই পরমতত্ত্বকে নির্দ্দেশ করে, এই কথাটা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন। সুতরাং যে যে নামই জপ করুক না কেন, যপ করিবার সময় তাহাকে পরমব্রহ্মের বা পরমতত্ত্বের ধ্যান করিতে হইত। গোস্বামী মহাশয়ের সাধনে নিষেধ ছিল মদ্যপান, পরদার বা ব্যভিচার, পরনিন্দা এবং মিথ্যা আচরণ, আর নিষেধ ছিল মাংস, ডিম এবং উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ। এ ছাড়া আর কোনও বাঁধাবাঁধি ছিল না। তাঁহার সাধনের বিধি ছিল ভূতশুদ্ধির জন্য প্রাণায়াম, সাধুভক্তি এবং সাধুসঙ্গ, আর নিয়মিতরূপে নামযপ। এই বিধিনিষেধের বাহিরে শিষ্যেরা স্বাধীনভাবে যদৃচ্ছা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। এইজন্য নিরাকার উপাসনা বা সাকার উপাসনা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্জ্জন, এ সকল বিষয়ে গোস্বামী মহাশয়ের সাধনের লোকেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। সনাতন হিন্দু, জ্ঞানপন্থীই হউন বা

কর্ম্মপন্থীই হউন, বৌদ্ধ ও জৈন মতাবলম্বী, আধুনিক আর্য্যসমাজী বা ব্রাহ্ম, এমন কি মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান, সকলেই এই সাধন গ্রহণ করিতে পারিতেন। কোনও বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের সাধনের কোনও বিরোধ ছিল না। এই দিক দিয়া দেখিলে গোস্বামী মহাশয়ের সাধন সত্যই অসাম্প্রদায়িক বা সার্ব্বজনীন, একথা বলা যাইতে পারে।

অশ্বিনীকুমার এই সাধন অবলম্বন করিয়া গুরুশক্তিপ্রভাবে এবং গুরুকৃপায় উত্তরোত্তর ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই সত্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রথমে বিচারযুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জ্ঞানের দুই পথ। এক ব্যতিরেকী, অপর অন্বয়ী। যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি, অনুমান উপমানাদির দ্বারা যাহার প্রতিষ্ঠা করিতেছি, তাহা কিছুই ব্রহ্ম নহে, এই ভাবেই ব্যতিরেকী ব্রহ্মজ্ঞানসাধন করিতে হয়। এইরূপে যখন জড়েতে আত্মবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপরে অতিন্দ্রিয়ের অধ্যাস, এবং ব্রহ্মবস্তু বা তত্ত্ববস্তু অবাঙ্‌মনসোগোচর এই প্রতীতি জন্মে ; এক কথায় যখন ব্রহ্মতত্ত্ব নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব এই ছয় বিশ্বাস জন্মে, তখনই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞানপথে ইহাই শেষ কথা নহে। এই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। এই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বিশ্বসমস্যার নিঃশেষ মীমাংসা হয় না। এই নিরাকার-ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রাণেরও তৃপ্তি হয় না। এই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে ভক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই জন্যই এই ব্যতিরেকী উপাসনার দ্বারা চিত্ত নির্ব্বিকার এবং বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে পরে সাধকের

অন্বয়ী উপাসনার অধিকার জন্মে। তখন সাধক যে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় বিশ্বকে ব্রহ্ম নহে বলিয়া পরমার্থ সম্পর্কশূন্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাকেই আবার পরমতত্ত্বের অধিষ্ঠানের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন। যে পথে ইন্দ্রিয়াতীত-ব্রহ্মসত্তার দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব আচ্ছন্ন এবং পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাই অন্বয়ী উপাসনার পথ। এই পথেই ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মতত্ত্বকে ভাবাঙ্গসাধনের আশ্রয়ে বিশ্বময় প্রত্যক্ষ করা যায়; এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যেই সাধক ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। এই অবস্থায় সাধকের নিকটে শব্দ অশব্দের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, রস অরসের দ্বারা রসায়িত হয়, গন্ধ অগন্ধকে আস্বাদিত করায়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা গ্রহণ করা অসম্ভব তাহাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। অরূপও তখন ভাব-ও-রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষ রূপের ভিতরেই তখন চক্ষু বাহ্য হারাইয়া অরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করে। এই অবস্থাতেই রাগানুগা ভক্তির সূচনা হয়।

আমি যখন প্রথমে একটু ঘনিষ্ঠভাবে অশ্বিনীকুমারের পরিচয় পাই, সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা, তখন তিনি এই অবস্থাতে প্রবেশ করিতেছিলেন। প্রথম যৌবনের ব্রাহ্মসমাজের সাধনভিত্তির উপরে অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনে তখন এই ভাবাঙ্গগঠনের সূত্রপাত হইয়াছে। সে সময় তিনি প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে দুই চারি জন অতিশয় অন্তরঙ্গ সতীর্থের সঙ্গে কীর্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। শোনা যায় যে কখনও কখনও এমনিভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন যে, জড় এবং উদ্ভিদকেও আনন্দমূরতি জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যাইতেন। এ অবস্থার সত্য বর্ণনা করা কঠিন। একদিকে ইহা নিতান্ত

কাল্পনিক ; আর এক দিকে ইহাকে একান্ত বাস্তবও বলা যায় না। সচ্চিদানন্দ পুরুষের অপরোক্ষ অনুভূতির পূর্ব্বে কোনও কোনও ভাগ্যবান্ সাধকের এইরূপ ভাবোন্মত্ততা জন্মিয়া থাকে। হতভাগ্য যাঁহারা তাঁহাদের এই ভাবাঙ্গ রাজ্যেই জ্ঞান এবং ভক্তির বিকাশ আপাততঃ শেষ হইয়া যায়। বস্তুপ্রত্যক্ষ তাঁহাদের ঘটে না, এ জীবনে ঘটে না, পরজন্মে সে সিদ্ধিলাভের জমিটা প্রস্তুত হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু ভগবদ্-প্রত্যক্ষ-লাভ না হইলেও এই ভাবাঙ্গসম্পদ্‌লাভ ছোট কথা নয়। এই ভাবাঙ্গ-সম্পদ্ যার লাভ হইয়াছে, বস্তুসাক্ষাৎকার লাভ না হইলেও এই ভাবাঙ্গের উপরে ভগবদ্‌স্বরূপের আভাস পড়িয়া সাধককে সত্য, ভক্তি এবং কর্ম্মযোগের পথে বহুদূর পর্য্যন্ত লইয়া যায়। এই মহাভাগ্য অশ্বিনীকুমারেরও লাভ হইয়াছিল

এই জন্য অশ্বিনীকুমার যে ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল শোনা বা পড়া কথা নহে, তাহার মধ্যে অশ্বিনীকুমারের নিজের জীবনের এবং সাধনের অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লুকাইয়া আছে।

---

(১)*

অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনের সূত্রটি পূর্ব্ব প্রবন্ধে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। কি অবস্থাধীনে, কোন্ কোন্ সূত্র অবলম্বনে অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মযোগ গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু যাহার প্রকৃতির ভিতরে যে বস্তু নাই, কেবল বাহিরের শক্তির প্রেরণায় সে বস্তু তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে না। অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মযোগের মূল ভিত্তি তাঁহার প্রকৃতির ভিতরেই নিহিত ছিল। ভক্তিপথে কর্ম্মযোগের মূল প্রেরণা ভগবদ্-প্রীতি। মানুষের প্রতি যাহার ভিতরে একটা স্বাভাবিক টান না থাকে সে সত্য ভগবদ্-প্রীতি কখনওই লাভ করিতে পারে না। অশ্বিনীবাবুর চরিত্রে বাল্যকাল হইতেই শুনিয়াছি এই লক্ষণটা দেখা গিয়াছে। প্রথম যৌবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া অশ্বিনীকুমার শ্রীরামপুর চাতরার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এ সময় অশ্বিনী-কুমার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাবে তাঁহার চরিত্র গড়িয়া উঠিতেছিল। এই জন্য সেকালের ব্রাহ্ম চরিত্রের সাধুতা এবং সংযম অশ্বিনীকুমারের চরিত্রেও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা যেরূপ একদিকে এই সাধুতা ও সংযমের অনুশীলন করিতেন, সেইরূপ অন্যদিকে অপরকেও এই বিশুদ্ধ চরিত্র লাভের জন্য কঠোর শাসন করিতে চাহিতেন। তাঁহারা অসংযম এবং অসাধুতা দেখিলে অতিশয় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেন। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে এই অসহিষ্ণুতা দেখা যায় নাই। এই জন্য যাঁহারা তাঁহার চরিত্রের উচ্চ আদর্শ লাভ

*বঙ্গবাণী মাঘ, ১৩৩০

করিতে পারিতেন না, তাঁহারাও অশ্বিনীকুমারের স্নেহ, সহানুভূতি বা সহবাস হইতে বঞ্চিত হইতেন না। শ্রীরামপুরে যখন তিনি শিক্ষকতা করেন, তখন তাঁহার চরিত্রের এই দিকটা বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের কেহ কেহ, শোনা যায়, অশ্বিনীকুমারের অপেক্ষা বয়সে নাকি বড়ই ছিলেন। আর বয়সের তুলনায় যাহাই হউক না কেন, অশ্বিনীকুমার সে সময় দেখিতে অনেকটা বালকের মতই নাকি ছিলেন। এইজন্য চাতরা স্কুলের বালকেরা অশ্বিনীকুমারকে প্রধান শিক্ষকের প্রাপ্য সম্মান দিতে প্রথমে প্রথমে রাজী ছিল না। এই কারণে প্রথমে স্কুলে কিঞ্চিৎ-পরিমাণে যথারীতি শাসন এবং শৃঙ্খলার ত্রুটি দেখা যাইতে আরম্ভ করে। স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ৺নন্দলাল গোস্বামী মহাশয় ইহাতে একটু ভীত হইয়া পড়েন, এবং এই প্রিয়দর্শন সুকোমল প্রকৃতি প্রধান শিক্ষকের দ্বারা বুঝি বা কাজ চলিবে না, এইরূপ আশঙ্কাও করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অতি অল্পদিন মধ্যেই চাতরা স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে আরম্ভ করিল। প্রধান শিক্ষকের শাসনদণ্ডের ভয়ে নহে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের অলক্ষ্য আকর্ষণে অতি অসংযত ছাত্ররাও ক্রমে সংযত হইয়া উঠে। এইখানেই অশ্বিনীকুমারের ভবিষ্যৎ কর্ম্মযোগের মূল সূত্রটি যে কি ছিল ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্ম সমাজের তদানীন্তন সাধনে সাধুতা এবং সংযমের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারে প্রকৃতি-নিহিত উদারতা এবং ভিন্ন মত ও ভিন্ন ভাবের সহিষ্ণুতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে ভবিষ্যৎ লোকনায়কত্বের জন্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। এইখানেই তাঁহার কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের নিগূঢ় সঙ্কেতটি পাওয়া যায়।

আযৌবন অশ্বিনীকুমার মানুষকে মানুষ বলিয়াই বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার এই মানব-প্রীতিতে ভালমন্দ বিচার ছিল না। যারা ভাল, তাহাদিগকে যেমন ভালবাসিতেন, যারা লোকচক্ষে ভাল নয় তাহাদিগকেও প্রায় সেইরূপই ভালবাসিতেন। নিজে সাধুচরিত্র হইয়াও যারা সাধুচরিত্র নহে, তাহাদিগকে তিনি কখনও দূরে ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। তখনও তাঁহার পরে নারায়ণ বুদ্ধি জাগ্রত হয় নাই। এ বুদ্ধি পরে জাগিয়াছিল। সেকালের ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্ত মানুষ এবং দেবতার মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করিয়াছিল, অশ্বিনীকুমারের মতবাদে তাহা তখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই। তথাপি মানুষকে মানুষ জানিয়াও ভালমন্দ জড়ান মানুষ বলিয়াই প্রাণের প্রকৃতিগত টানে অশ্বিনীকুমার যাহার সহবাসে আসিতেন, তাহাকেই নিজের প্রাণের ভিতরে টানিয়া লইতেন। আর এই জন্যই আপনার ভিতরের সাধুতা এবং প্রীতির শক্তির দ্বারা অপরের অসাধুতা এবং অসংযমকে তাহাদের অজ্ঞাতসারে শোধন করিয়া লইতেন। এইরূপই শুনিয়াছি শ্রীরামপুরের সে সময়ের উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র যুবকদিগকে অশ্বিনীকুমার সংযত এবং সু-শাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাহিরের শাসন ছাড়াও যে চঞ্চলমতি যুবকগণকে সংযত ও সাধুশীল করা যায় ইহা দেখিয়া নন্দলাল গোস্বামী মহাশয় নাকি বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং ছোট্ট প্রধান শিক্ষকটিকে আনিয়া তাঁর প্রথমে যে আশঙ্কা হইয়াছিল, অতি অল্পদিনের মধ্যেই নাকি সে আশঙ্কা দূর হইয়া যায়।

চাত্‌রা স্কুলে অশ্বিনীকুমারের যে কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়, বরিশালে যাইয়া তাহাই ফুটিয়া এবং গড়িয়া উঠে। প্রথমে অশ্বিনীকুমার ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু

তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে ইহা খাপ খাইল না। যে সকল উপাদানে ওকালতী ব্যবসা জাঁকিয়া উঠে অশ্বিনীকুমারেরর সে সকলই ছিল। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, সূক্ষ্মদর্শিনী বিচারশক্তি ছিল, অসাধারণ বাক্‌পটুতাও ছিল: এই সকলই ওকালতীর পুঁজি। আপনার প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিয়া বড় উকীল হইতে চাহিলে অশ্বিনীকুমার সহজেই এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে চেষ্টা করিলেন না। নিজের কাছে খাঁটি হইতে যাইয়া অল্পদিন মধ্যেই ওকালতী ছাড়িয়া দিলেন। তখন শুনিয়াছি একবার সরকারী কর্ম্ম লইবার জন্যও তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় খ্যাতনামা সদরালা ছিলেন। ইংরাজ সরকারে তাঁহার প্রতিপত্তিও ছিল। ইচ্ছা করিলেই তিনি পুত্রকে ডেপুটি করাইয়া নিতে পারিতেন। কিন্তু রাজসেবাতে যতই অর্থ এবং সম্মানলাভ হউক না কেন, অনেক সময় মানুষের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করিয়া রাখে। ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ভুক্তভোগী হইয়া ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজসেবা অবলম্বন করে, এই জন্য তিনি ইহা চাহেন নাই। মনে হয়, স্বদেশীর যুগে অশ্বিনীকুমারের মুখেই একথাটা শুনিয়াছিলাম। অশ্বিনীকুমার সরকারী চাকুরী গ্রহণের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলেন। চাতরা স্কুলে তাঁহার যে সাধন এবং অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছিল, তাহা লইয়াই তিনি বরিশালে নিজে একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার প্রধান শিক্ষকের ভার গ্রহণ করেন। এইখানেই অশ্বিনীকুমারের জীবনব্যাপী কর্ম্মযোগের আরম্ভ হয়। তখনও অশ্বিনীকুমার গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয়লাভ করেন নাই।

কিন্তু নিজের প্রকৃতির প্রেরণায় লোকসেবাতে আত্মোৎসর্গ করেন।

অশ্বিনীকুমার কেবল স্কুলে ছাত্র পড়াইয়াই আপনার কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতেন না। ছাত্রদিগকে লইয়া দল বাধিয়া লোকসেবায় নিযুক্ত হইলেন। সে সময়ে বরিশালে বিসূচিকা প্রায় সারা বছরই লাগিয়া থাকিত। সম্প্রতি জলের কল হইয়া সহরের স্বাস্থ্য অনেকটা শোধরাইয়াছে। গ্রামের লোকেরা মামলা-মোকদ্দমা বা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বদাই সহরে যাতায়াত করিত। বিসূচিকার দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহাদের সেবাশুশ্রূষা করিবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অনেক সময় ইহারা ঔষধ এবং পথ্য পাইত না। মরিলে সৎকারের জন্যও লোক জুটিত না। অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্কুলের ছাত্রদিগকে লইয়া এ সকল অসহায় রোগীদিগের সেবার ব্যবস্থা করেন। রোগীর শুশ্রূষা, নিজের হাতে কলেরা রোগীর মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা, ভিক্ষা করিয়া তাহাদের ঔষধ এবং পথ্য সংগ্রহ করা, এবং মরিলে তাহাদের যথাবিহিত সংস্কার করা; অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার সহসেবীদিগের প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল। এই লোকসেবায় ইহারা জাতবর্ণের বিচার করিতেন না। ব্রাহ্মণসন্তানেরা চণ্ডালের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন। হিন্দু-যুবকেরা মুসলমান রোগীর সেবা করিতেন। মৃতদেহ সৎকারে জাতিধর্ম্ম ভেদ করিতেন না। এইরূপে বরিশালে অশ্বিনীকুমার এক অপূর্ব্ব সেবা-ব্রতের প্রতিষ্ঠা করেন। তখনও অশ্বিনীকুমার গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয়-লাভ করেন নাই। পরে তিনি গুরুশক্তির আশ্রয় পাইয়া পরে যে নারায়ণ-বুদ্ধির সাধন করিয়াছিলেন, তখনও সে বুদ্ধি জাগে নাই। কিন্তু এই লোকসেবার উপরেই ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরজীবনের ভক্তি-

প্রেরিত কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সেবার ভিতর দিয়া অশ্বিনীকুমার ঘৃণা, লজ্জা, ভয় জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় থাকিতে মানুষ কখনও সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সাত্ত্বিক কর্ম্মের আশ্রয় ব্যতিরেকে কর্ম্মযোগও সাধিত হয় না।

অশ্বিনীকুমারের গুরুদেব তাঁহাকে কর্ম্মযোগের তিনটি মুখ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে বলিয়াছিলেন—শ্রীমান্ দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট ইহা শুনিয়াছি। দেবকুমার বাবুকে অশ্বিনীকুমার নিজে একথা কহিয়াছিলেন। কর্ম্মযোগের এই সূত্র তিনটির প্রথম সূত্র সত্যরক্ষা ; দ্বিতীয় সূত্র ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণ। তৃতীয় সূত্র মানবে দেববুদ্ধির অনুশীলন। অশ্বিনীকুমার সেকালের ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা-দীক্ষা হইতেই কর্ম্মযোগের প্রথম দুইটি সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে ভয়কে জয় করিতে না পারে সে কখনও সর্ব্বদা সত্যরক্ষা করিতে পারে না। সত্যরক্ষা করিতে হইলেই ভয়কে জয় করিতে হয়। যে প্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতে প্রহৃষ্ট হইয়া উঠে না, অপ্রিয় প্রাপ্তিতে ক্লিষ্ট হয় না, প্রিয় এবং অপ্রিয়ে যার সমবুদ্ধিলাভ হইয়াছে, সেই কেবল সর্ব্বদা সত্যরক্ষা করিয়া চলিতে পারে। সত্যরক্ষার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। ব্রহ্মচর্য্য বা শুক্রধারণের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়। সত্য চিত্তকে এবং ব্রহ্মচর্য্য দেহকে নির্ভীক করে। এই জন্যই যাঁহারা আত্মসুখবাসনা বিবর্জ্জিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মসাধন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সত্য-রক্ষার এবং ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম নিষ্ঠাসহকারে অবলম্বন করিতেই হয়। কিন্তু কেবল ইহাতেই প্রকৃত কর্ম্মযোগ গড়িয়া উঠে না। নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ এ নয় যে কোনও কামনাই করিবে না, যন্ত্রারূঢ়ের মতন কর্ম্ম করিয়া যাইবে। নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ এই যে, আত্মসুখকামনার

প্রেরণায় কর্ম্ম করিবে না। প্রাচীন কালের যজ্ঞাদিকর্ম্ম স্বর্গাদিলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইত। সুতরাং সে সকল কর্ম্ম নিষ্কাম ছিল না। পুত্রং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি, এই প্রার্থনা মুখে করিয়া যে দেব আরাধনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নিষ্কাম নহে। এই আরাধনার মূলে আত্মসুখ কামনা রহিয়াছে। বিষ্ণু-প্রীতিকাম হইয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম। 'হে অর্জ্জুন, তুমি যে যজ্ঞ যজন কর, যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, যে ভক্ষ্য ভক্ষন কর, যে দেয় দান কর—তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং—সে সমুদয় আমাতে অর্পণ কর।' গীতায় ভগবান্ নিষ্কাম কর্ম্মের এই সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের আশ্রয়—মানুষ। এই মানুষকে যতক্ষণ না দেবতা বলিয়া ধরিতে পারা যায়, ততক্ষণ নারায়ণে কর্ম্ম অর্পণ করা অসাধ্য। সামান্য বুদ্ধিতে যতটুকু ধরিতে পারি, অশ্বিনীকুমারের গুরুদেব তাঁহাকে যে কর্ম্মসূত্র ধরাইয়া দিয়াছিলেন ইহাই তাহার নিগূঢ় অর্থ।

অশ্বিনীকুমার গুরুদত্ত নাম পাইয়া ভাবাঙ্গসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার প্রকৃতি বিশেষভাবে ভাবপ্রবণ ছিল। এইজন্য এই ভাবাঙ্গ-সাধন তাঁহার প্রকৃতিসম্মতই হয়। ভাবাঙ্গসাধনে প্রথম অবস্থা রূপের অন্তরালে অরূপের অনুভব। শ্রেষ্ঠতর কবিগণ সর্ব্বদাই এই প্রত্যক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অপ্রাণীতে প্রাণ আরোপ করেন না; কিন্তু বাহিরের চক্ষু যাহাতে প্রাণহীন বলিয়া দেখে, কবির অন্তর্দৃষ্টি তাহারই মধ্যে অনন্তদৃষ্ট প্রাণলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। মেঘদূতের মেঘ কালিদাসের চক্ষে জড় পদার্থ ছিল না, কিন্তু প্রাণবান্, সহৃদয়, বিরহ বিধুরার দুঃখে সমদুঃখী পুরুষরূপেই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। প্রাকৃতজনে যাহাকে কবিকল্পনা বলিয়া মনে করে, কবির চক্ষে তাহা কল্পনা নহে,

প্রত্যক্ষ সত্য। বস্তুর বহিরঙ্গে এ সত্য প্রকাশিত হয় না। বস্তুর উপরে যখন ভাবের রসায়ন পড়ে, তখনই সেই বস্তুর অন্তরের ভাবাঙ্গ স্ফুরিত হয়; এবং ভাবুক চর্ম্মচক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, তাহাই এই চর্ম্মচক্ষু দিয়াই দেখিয়া থাকেন। পাতাবাহারের গাছ বা পুষ্প-ভাবপূর্ণ বল্লরী কত সময়ই ত দেখিয়াছি। কিন্তু হঠাৎ একদিন চক্ষে কি কাজল মাখিয়া গেল জানি না; এই গাছ ও এই লতা দেখিয়াই সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে ধরিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। এই আকাশ ত প্রতিনিয়তই দেখিতেছি; কিন্তু একদিন নিদাঘ দ্বিপ্রহরে এই অনন্ত নীলবক্ষে কি রূপ ফুটিয়া উঠিল যে প্রাণটা দেহপিঞ্জর ও ইন্দ্রিয়ের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ঐ নীলবক্ষে যাইয়া মিলিয়া যাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিল। উপবনে পাখী ত শত শত দেখিয়াছি, রাজপথে ঘোড়া কত কত দেখিয়াছি, কিন্তু একদিন এমন হইল যে ঐ পাখীর সঙ্গে পাখী হইয়া উড়োপড়ি ও জড়াজড়ি করিবার সাধ জাগিল, আর ওই ঘোড়ার প্রত্যেক পেশীর ভিতর দিয়া কি এক অপূর্ব্ব রূপের ছটা ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল যে সেই রূপসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সর্ব্বাঙ্গ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এইরূপেই প্রথমে ভাবাঙ্গ গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এ অধ্যাস নহে। ইহা বস্তুসাক্ষাৎকার। গুরুশক্তি সঞ্চারে গুরুদত্ত নামের মহিমায় অতি অকৃতী জনেরও এ অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। তখনও অরূপ স্বরূপে গড়িয়া উঠে নাই; কিন্তু রূপের ভিতরেই আপনার আভা ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য, সদ্‌যুক্তিসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে যখন অন্তরের রস বা ভাব মিলিয়া যায়, তখনই এই ভাবাঙ্গ গড়িতে আরম্ভ করে; এই পথেই সাধক ক্রমে মানুষে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া

দেববুদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হয়েন। ইহাই সত্য কর্ম্মযোগের বনিয়াদ।

অশ্বিনীকুমার গুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে সত্যরক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য্যের পথে চলিয়া ক্রমে মানবপ্রীতির অনুশীলনের ভিতর দিয়াই মানুষে ভগবদ্‌বুদ্ধির সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার কর্ম্মচেষ্টা সর্ব্বদাই নিষ্কাম এবং ভগবদ্‌প্রীতিকাম হইয়া চলিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এ পথ অতিশয় কঠিন পথ। পণ্ডিতেরা ইহাকে শানিত ক্ষুরধারের মতন করিয়াছেন। এই দুর্গম পথে চলিতে হইলে আপনাকে একেবারে আরেক জনের হাতে ছাড়িয়া দিতে হয়। এই ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ এ নহে যে, আপনার বিচারবুদ্ধিকে বা ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে উপেক্ষা বা বর্জ্জন করিয়া চোখ বুজিয়া আরেকজনের হাত ধরিয়া চলিতে হয়। সদ্‌গুরুর পথ এ নহে। যে গুরু শিষ্যের ভিতর হইতে তাহাকে তাহার প্রকৃতির সূত্র ধরিয়া সাধনপথে প্রেরিত না করেন, তিনি সদ্‌গুরু নহেন। সদ্‌গুরুর প্রেরণা বাহিরের উপদেশে নহে, অন্তরের জ্ঞান এবং ভাবের উন্মেষে। প্রেমিক যুগল পরস্পরের নিকটে নীরবে বসিয়া একে অন্যের চিত্তকে একে অন্যের ভাবের দ্বারা যেমন উদ্বেলিত করিয়া তুলেন, সদ্‌গুরু সেই রূপ শিষ্যের সঙ্গে একাত্ম হইয়া শিষ্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সেই প্রকৃতিকে মার্জ্জিত, বিশুদ্ধ এবং রসরসায়িত করিয়া তাহার ভিতর হইতেই তাহার ধর্ম্ম ও এবং সাধনাকে ফুটাইয়া তুলেন। মহাভাগ্যবলে ধন্য সেই যাহার এমন সদ্‌গুরু মিলিয়াছে। গুরু শিষ্যকে অধিকার করেন; শিষ্য গুরুর সঙ্গে একাত্ম হইয়া যান। এখানে আত্মসমর্পণ অর্থই আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই কথাটা না বুঝিলে সদ্‌গুরুতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। এই কথাটা না বুঝিলে

গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করার অর্থ ধারণাতে আসিবে না। গুরুর মধ্যে শিষ্য আপনাকেই প্রাপ্ত হন। এই জন্য গুরুর নিকটে আত্মসমর্পণ করাতে শিষ্যের আত্মহত্যা হয় না। হয় সেখানে যেখানে শিষ্য ভিতরে আপনাকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিয়া বাহিরে গুরুর নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে যান।

এইরূপে আরেক জনের হাতে যে আপনাকে না বিকাইয়া দিয়াছে, সে কখনও সত্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন করিতে পারে না। অশ্বিনীকুমার সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার কর্ম্মযোগ বহুল পরিমাণে সার্থক হইয়াছিল।

সকল প্রকারে আত্মসুখ কামনা ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া মানুষ যে কর্ম্ম করে, তাহাই সত্য নিষ্কাম কর্ম্ম। মানুষে দেবতাবুদ্ধি সাধন করিয়া লোকসেবাও এই নিষ্কাম কর্ম্মের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া লোকসংগ্রহার্থ, সমাজ-রক্ষার জন্য যে নিঃস্বার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহাও নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ভগবদ্‌গীতায় ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে, দেশ-ধর্ম্ম বা নেশান ধর্ম্ম প্রাচীন সমাজধর্ম্মকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রাচীনদিগের সমাজের স্থানে, আমাদিগের স্বদেশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই যুগে দেশ-সেবাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনের অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে, দেবীচৌধুরাণীতে এবং সীতারামে এই দেশ-প্রীতির বা দেশমাতৃকার প্রতি যে ভক্তি তাহারই উপরে আধুনিকদিগের সত্য নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারও অনেকটা এই

পথেই আপনার জীবনের কর্ম্মযোগ সাধন করিরা গিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের স্বদেশপ্রীতি এবং স্বজাতিবাৎসল্য কতটা পরিমাণে নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম ছিল, স্বদেশীর সময় তার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম।

সাধকেরা আত্মসুখ কামনাকে 'মার' বা 'মায়া' বা 'শয়তান' বলিয়াছেন। সাধক যখন একে একে আপনার নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিয়া, সিদ্ধির সন্নিকটবর্ত্তী হয়েন, তখন এই 'মার' বা 'মোহিনী' বা 'শয়তান' তাঁহার সাধন ভঙ্গ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। যীশুর জীবনে ইহার কথা পড়িতে পাই। দীক্ষালাভের পরে যীশু চল্লিশ দিন উপবাস করিয়া নিঃশেষ আত্মজয় করিয়াছিলেন। এই সময়ই 'শয়তান' তাঁহাকে উচ্চ পর্ব্বতশিখরে লইয়া গিয়া সমগ্র পৃথিবীর একাধিপত্য দিতে চাহিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, যখন তাঁহার দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইল, সকল বিষয়বাসনা যখন নষ্ট হইল, তখন তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তি ও ঐশ্বর্য্যকে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে প্রয়োগ করিবার জন্য 'শয়তান' তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। এই প্রলোভন জয় করিয়াই তিনি চরমসিদ্ধি লাভ করেন। এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রলোভন অতি ভয়ানক। নানা আকারে, নানা বেশে, নানা ছলাকলা অবলম্বন করিয়া এই আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। এই প্রলোভন স্বদেশসেবীর নিকটে সর্ব্বদা উপস্থিত হয়। অনেক সময়, কোন্‌টাকে দেশের সত্যস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা আর কোন্‌টাকে দেশ-নায়কের বা দেশসেবকের আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, ইহা তিনি নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অশ্বিনীকুমার, গুরুকৃপায়, এই প্রলোভনকে কতটা পরিমাণে জয়

করিয়াছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইহার অনেক প্রমাণপরিচয় পাইয়াছিলাম।

বিরোধের মুখে মানুষের রাজসিক ভাবই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। বিরোধের সময় প্রতিপক্ষের প্রতিকূলে সর্ব্বতোভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই ক্ষাত্রধর্ম্মও বটে। বিরোধের প্রকৃতিই এই ধর্ম্মকে প্রণোদিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। স্বদেশীর আন্দোলনে দেশে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে একটা বিরাট বিরোধ জাগাইয়াছিল। এই বিরোধের মাঝখানে লোকনায়কেরা যদি প্রজাপক্ষকে প্রবল করিবার জন্য, রাজশক্তির সম্মুখীন হইয়া, আত্মশক্তি প্রকট করিতে চান, ইহা একদিক দিয়া দেখিলে, কিছুই দোষের হয় না। এই পথেই প্রজাসাধারণের মোহ ও ক্লীবত্ব নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রবল সংগ্রামের মাঝখানেও অশ্বিনীকুমার আপনার যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন নাই, ইহা কম কথা নহে।

আমরা তখন অশ্বিনীকুমারের কোনও কোনও কর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কখনও কখনও তাঁহাকে ভীরু, কৃপণ, স্বক্ষতিসহনে অসমর্থ বা অপারগ বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে, সকল দিক তাকাইয়া দেখিবার যখন অবসর পাইলাম, তখন এ সকল বিষয়ে অশ্বিনীকুমারের দুর্ব্বলতার নহে, অসাধারণ আত্মসংযমের শক্তিরই পরিচয় পাইয়াছিলাম।

বরিশাল স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ও পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের জীবনব্যাপী লোকসেবা ও দেশসেবার ফলে, বরিশাল এই অনন্যসাধারণ মহিমা লাভ করিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারই সত্য বলিতে গেলে, দেশে একমাত্র লোকনায়ক ছিলেন।

অপরের ধীশক্তি তাঁহার অপেক্ষা বেশি ছিল। কাহারও কাহারও বিদ্যাবুদ্ধি এবং বাক্‌পটুতা অশ্বিনীকুমারের চাইতে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু ইঁহারা সকলেই ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। দেশের জনসাধারণে ইঁহাদের কথাও সকল সময় বুঝিয়া উঠিত না, আর বুঝিলেও ইঁহাদের কাহারও সঙ্গেই অশিক্ষিত প্রকৃতিপুঞ্জের কোনও সত্য প্রাণের যোগ ছিল না। কেবল বরিশালে, অশ্বিনীকুমারের সহিতই, জেলার জনসাধারণের এই প্রাণের যোগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এরূপ শোনা যায় যে বরিশালের সরল চাষীরা অশ্বিনীকুমারের নামে 'মানত' করিত। তরিতরকারীর ফসল বুনিবার সময় প্রথম ফল অশ্বিনীকুমারকে দিবে, এই সংকল্প করিয়া, তাঁহার শুভকামনা প্রার্থনা করিত। এরূপ সম্বন্ধ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অপর কোনও নেতার জন্মে নাই। সে-কালে বরিশালের সর্ব্বসাধারণ লোক অশ্বিনীকুমারের কথায় বা ইঙ্গিতে উঠিত বসিত। ইংরাজ আমলে আর কোথাও তখন পর্য্যন্ত এমন লোকনায়কের জন্ম হয় নাই। অশ্বিনীবাবুর এই অসাধারণ প্রভাব দেখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভীত হইয়াছিলেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। স্বদেশীর সময় বরিশালে এক ছটাক বিলাতি নুন ও এক বিঘত বিলাতি কাপড় বাজারে কেহ কিনিতে পাইত না। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে পর্য্যন্ত বিলাতী নুন, বিলাতী চিনি এবং বিলাতী কাপড় কিনিতে হইলে, অশ্বিনীকুমারের হুকুম আনাইতে হইত; ইহাতেই বরিশালের জনসাধারণের উপরে অশ্বিনীকুমারের কতটা প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়।

অশ্বিনীকুমারের এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব ইংরাজ আমলাতন্ত্রের অসহ্য হইয়া উঠিল। ইঁহারা যে ভাবে দেশের শাসনযন্ত্রটাকে গড়িয়া

তুলিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের প্রতাপের উপরেই দেশের শান্তি ও ইংরাজের আত্মরক্ষা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছিল। কোনও জেলায়, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চাইতে কোনও প্রজার প্রভাব বেশি হইলে, সে জেলায় ইংরাজ প্রভুশক্তির মূল-উচ্ছেদ হইল, রাজপুরুষদিগের এরূপ ধারণা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের মুখে, কেবল বরিশালে নহে, পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র রাজপুরুষদিগের প্রভাব নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। নূতন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তা, স্যার বেম্‌ফাইল্‌ড্‌ ফুলারের পর্য্যন্ত সমুদয় প্রতাপ্ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফরিদপুরের রেলের মজুরেরা ছোটলাটের মাল ছুঁইতে চাহে নাই; পুলিশের কনেষ্টবলেরা তাঁহার বিছানাপত্র রেলগাড়ী হইতে নামাইয়া, ডাকবাংলায় বহিয়া লইয়া যায়। ঢাকায় ফুলার বাহাদুরের অভ্যর্থনার জন্য পঞ্চাশ জন লোক পর্য্যন্ত নাকি জাহাজ ঘাটে উপস্থিত হয় নাই; অথচ বুড়ীগঙ্গাতে যখন তাঁহার জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, তখন নদীতীরে দশ পোনর হাজার লোক জড় হইয়া স্বদেশী-সভা করিয়া 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে দিক্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। এই অপমানের উল্লেখ করিয়া নাকি ফুলার সাহেব কহিয়াছিলেন, দেবদূতেরা পর্য্যন্ত এরূপ অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না—not even angles could bear it. ঢাকা হইতে ফুলার সাহেব বরিশালে যান। যাবার পূর্ব্বে আসামের সীমান্ত জেলায় তার করিয়া একশত সশস্ত্র গুর্খা পুলিশকে বরিশালে পাঠাইবার হুকুম দেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই গুর্খা পুলিশেরা বরিশালে যাইয়া পৌঁছে। বরিশালে যাইয়াই ছোটলাট অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে তাঁহার জাহাজে ডাকিয়া পাঠান। এই সংবাদে বরিশালের লোক নদীতীরে আসিয়া নিবিড় জনতা করিয়া দাঁড়ায়।

ছোটলাটের জাহাজের সম্মুখে গুর্খা পল্টনেরা কাতার দিয়া, সঙ্গীণ তুলিয়া দাঁড়ায়। এই পল্টনের মাঝখান দিয়া, এই সংক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের সমক্ষে অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা ছোটলাটের জাহাজে যাইয়া উঠিলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়াই ফুলার বাহাদুরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মতন জাহাজের ডেকে পদচারণ করিতে করিতে, তিনি অশ্বিনীবাবুদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন:—আগুন নিয়া খেলা! অগুন নিয়া খেলা!—Playing with fire! Playing with fire! তার পরেই অতিশয় রূঢ়ভাবে তাঁহাদিগকে বিলাতি পণ্যবর্জ্জনের যে ইস্তাহার তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিতে হুকুম দিলেন। অশ্বিনীকুমার বিষম সমস্যায় পড়িলেন। একদিকে এই ইস্তাহার প্রত্যাহার করিলে, সাধারণে তাঁহাকে ভীরু, কাপুরুষ বলিয়া ভাবিবে,—বরিশালে যেরূপ জোরে বিলাতী পণ্য বর্জ্জিত হইতেছিল, তাহাও হয়ত কমিয়া যাইবে। অন্যদিকে ছোটলাট যেরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বরিশালের নেতৃবৃন্দকে তখনি গ্রেপ্তার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, জাহাজেই তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া গুর্খাদের দ্বারা জেলখানায় পাঠাইয়া দিতে পারেন। ইহাতে অশ্বিনীবাবু ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের উপরে যা' কিছু অত্যাচারের আশঙ্কা থাকুক না কেন, বরিশালের এই জনসমুদ্র ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া এমন একটা অনর্থ বাধাইয়া দিবে যে, বরিশালে তাহার ফলে রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইবে। একশ গুর্খা এ শোণিতপাত নিবারণ করিতে পারিবে না। এই সঙ্কটে কর্ত্তব্য কি?

অশ্বিনীকুমার যদি তখন নিজের যশের কথা ভাবিতেন, লোকে

সচরাচর যে ভাবে এ সকল বিচার করে, সেভাবে যদি এই সমস্যার মীমাংসা করিতে যাইতেন, তাহা হইলে ফুলার সাহেবের আদেশ অগ্রাহ্যই করিতেন। ইহার ফলে তিনি হয়ত একটা অসাধারণ আত্ম-ত্যাগের গৌরবও লাভ করিতেন। দেশের জন্য জেলে যাইয়া, অশ্বিনীকুমার স্বদেশী আন্দোলনে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করিতে পারিতেন, কিন্তু অন্যদিকে ইহার ফলে বহু প্রজাক্ষয় হইত। প্রজা সাধারণের অন্তরে স্বদেশী আন্দোলনের মুখে যতটুকু সৎসাহস ও আত্ম-ত্যাগের শক্তি জাগিয়াছিল রাজশক্তির উৎপীড়নে তাহাও একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইত। এই দুই দিক ওজন করিয়া, অশ্বিনীকুমার নিজের যশ ও প্রতিপত্তিকে প্রজার কল্যাণের জন্য বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। ফুলার সাহেবের আদেশে নিজেদের ইস্তাহার প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাহার করিলেন। তাঁহার এই কাজটা সে সময়ে আমাদের অনেকেরই ভাল লাগে নাই। সে সময়ের দেশের লোকে অনেকে তাঁহার 'ভীরুতার' নিন্দা করিয়াছিলেন। তিনি কি ভাবিয়া, কোন্ আদর্শের প্রেরণায়, এ কাজটা করিয়াছিলেন, লোকে তাহা ধরিতে পারে নাই। অর্থলোভ ছাড়া সহজ, প্রাণের মায়া ও ছাড়া সহজ; কিন্তু লোকনায়কদিগের পক্ষে যশ ও জনমণ্ডলীর উপরে প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার লোভ পরিত্যাগ করা সহজ নহে। অশ্বিনীকুমার এক্ষেত্রে এই লোভ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; ইহাতেই তাঁহার কর্ম্মযোগের প্রকৃতিটি বুঝিতে পারা যায়।

অশ্বিনীকুমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সাধন আশ্রয় করিয়াছিলেন। ভগবানে নির্ভর কর্ম্মযোগীর প্রধান লক্ষণ। অশ্বিনীকুমারের জীবনে ও চরিত্রে সর্ব্বদা এই নির্ভর দেখা গিয়াছে। মৃত্যুশয্যায়ও তিনি এই

আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হন নাই। জীবনের শেষ দুই তিন বৎসর যখন সকল কর্ম্মের বাহির হইয়া পড়েন, তখনও তাঁহার এই নির্ভর নষ্ট হয় নাই। রোগে শোকে, কিছুতেই তাঁহার অন্তরের প্রসন্নতা হরণ করিতে পারে নাই। জীবনের শেষ দশায় সর্ব্বদাই কহিতেন, যে পাঁয়ষট্টি বৎসর কাল সংসারে ছুটোছুটি করিতে দিয়াছে, শেষের দু'তিন বৎসর যদি বসিয়া থাকিতেই বলে, তাতে আপত্তি করিব কেন?

এই ভগবন্নির্ভরতাই অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মযোগের প্রাণ ছিল। এই ভক্তি দ্বারাই তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার দত্ত*

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতেই আমাদের রাষ্ট্রীয় ও স্বাদেশিক কর্ম্মক্ষেত্রে একটা নূতন বস্তুর আমদানী হইয়াছে। ইহার নাম নেতা বা নায়ক বা 'লীডার'। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এ কথা আমরা শুনি নাই। কৃষ্ণদাস পাল জমিদার-সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না, মুখপাত্র বা প্রতিনিধি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বা আনন্দমোহন, শিশিরকুমার বা কালীচরণ, ইঁহাদের কেহই সেকালে নেতা উপাধি লাভ করেন নাই, কিন্তু দেশের নব্য শিক্ষা-প্রাপ্ত সমাজে ইঁহাদেব অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। আমার মনে হয় যে, সে সময়ে আমরা যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শ ধরিয়া চলিতেছিলাম, তাহা কোন লোকবিশেষের নেতৃত্বের দাবী সহ্য করিতে পারিত না বলিয়া সে যুগে আমাদের মধ্যে নেতার বা নায়কের বা লীডারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। এখন যে বস্তুকে আমরা নেতা বলি সে বস্তু তখনও ছিল। মনের ভাবে তো আর সংসারে কোথাও বস্তু-বিপর্য্যয় ঘটে না। তবে আমরা তখন সে বস্তুকে নেতা বা নায়ক বা লীডার বলিয়া ডাকিতাম না, ইহাই কেবল সত্য।

আর আজ আমরা এই সকল নামকরণ করিতেছি বলিয়া যে নূতন বস্তু লাভ করিতেছি, এমনই কি বলা যায়? সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কর্ম্মী ও মনীষীগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি ছিলেন, এখনও আছেন। আমরা এখন তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি না বলিয়া নেতা বলিতে বেশি ভালবাসি; কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের কথার

---

*চরিত-চিত্র পুস্তকে প্রকাশিত

জোরে তাঁরা নেতা বা নায়ক হইয়া উঠেন, এমনও বলা যায় না। ফলতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত নায়কত্বলাভ করা সহজ ব্যাপারও নহে। আমরা লেখাপড়া জানি কিম্বা না জানিলেও জানি বলিয়া আমাদের যে অভিমান জন্মিয়াছে, তাহার দরুণ কেহ আমাদের প্রকৃত নেতা হইতে পারেন না। আমরা বিচার করি, যুক্তি করি, পরখ করি, লাভালাভ গণনা করি; তার পরে যাঁর কথা আমাদের মনোমত হয়, তাঁহাকে আমাদের মুখপাত্র বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু কাহারও কথায় আমরা উঠিতে বসিতে পারি না। কাহারও পশ্চাতে যাইয়া দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে জানি না। কাহারও মান বা প্রাণ রক্ষার জন্য আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে, ক্বচিৎ ধর্ম্মের ব্যাপারে সম্ভব হইলেও, সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর নহে। এই জন্য কেবল ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে যাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে লোক-প্রতিনিধি বলা যায়, কিন্তু লোক-নায়ক বলা যায় না।

বস্তুতঃ আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মিগণের মধ্যে কেবল একজনমাত্র প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত।

অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্তু কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন; সদ্বক্তা, কিন্তু দৈবী প্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী নহেন। সুললিত বাক্য যোজনা করিয়া তিনি বহু লোককে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু শব্দ ও ভাবের বন্যা ছুটাইয়া তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন না। তিনি সাহিত্যিক,—তাঁর 'ভক্তিযোগ' বাংলাভাষায় একখানি

অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ; কিন্তু যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা সমাজে নূতন আদর্শ ও নূতন উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, সে সৃষ্টি-শক্তি তাঁহার নাই। তিনি দরিদ্র নহেন, পিতৃদত্ত সম্পত্তি দ্বারা তাঁর সাংসারিক সচ্ছলতা সম্পাদিত হয় ; কিন্তু যতটা ধনের অধিকারী হইলে, সেই ধনের শক্তিতে লোকে সমাজপতি হইয়া উঠে, অশ্বিনীকুমারের সে বিভব নাই। অশ্বিনীকুমার বি. এল. পাশ করিয়া কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন ; সে দিকে মনোনিবেশ করিলে তিনি আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের অগ্রণীদলভুক্ত হইতে পারিতেন না যে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে দিকে বিধিমত চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বড় উকীল কৌন্সিলী হইয়া লোকে সমাজে যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব লাভ করে, অশ্বিনীকুমার তাহা পান নাই। সরকারী কর্ম্মে কৃতিত্বের দ্বারাও সমাজে এক জাতীয় নেতৃত্ব লাভ করা যায়। অশ্বিনীকুমারের পিতা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন ; ইচ্ছা করিলে অশ্বিনীকুমারও সহজেই একটা ডেপুটিগিরি জুটাইতে পারিতেন, আর তাঁর বিদ্যা ও চরিত্রগুণে রাজকার্য্যে যে খুবই কৃতিত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এ সকলের কিছুই করেন নাই। যে গুণ থাকিলে, যে কর্ম্ম ও কৃতিত্ব-বলে সচরাচর আমাদের মধ্যে লোকনেতৃত্ব লাভ হয়, অশ্বিনীকুমার তার কিছুই দাবী করিতে পারেন না। তথাপি, তাঁর মতন এমন সত্য ও সাচ্চা লোক-নায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্ম্মিগণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না।

ফলতঃ আমার মনে হয় যে, আমাদের চিন্তানায়ক অনেক আছেন কিন্তু লোকনায়ক নাই। কেহ বক্তা, কেহ কবি, কেহ মসীজীবী, কেহ ব্যবহারজীবী, কেহ বা ধনে, কেহ বা পদে বড়। এই সকল লোকে

মিলিয়া দেশের মনের গতি ও কর্ম্মের আদর্শ বদলাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। ইহারা না থাকিলে বাংলা আজ যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে যাইতে পারিত না। ইহারা দেশের প্রাণতা বাড়াইয়া দিয়াছেন, লোক-চরিত্রকে উদার ও উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই সত্য অর্থে লোকনায়ক নহেন। লোকে ইঁহাদের পুস্তক আনন্দে পড়ে, ইঁহাদের বক্তৃতা আগ্রহে শোনে, ইঁহাদের গুণগান প্রাণ খুলিয়া করে, ইঁহাদিগকে সভাসমিতিতে উচ্চ আসনে লইয়া গিয়া বসায়, পথে দেখা হইলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়, দেশহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে ইঁহাদিগকে আদর করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করে। এ সকলই করে; করে না কেবল সত্যভাবে ইঁহাদের অনুবর্ত্তন। যতদিন লোকের মনের সঙ্গে ইঁহাদের কথা মিলিয়া যায়, লোকের ভাবের সঙ্গে ইঁহাদের উপদেশ মিশ খায়, লোকে যাহা আপনা হইতে চাহে যত দিন ইঁহারা সে পথে নিজেরা চলিতে ও তাহাদিগকে চালাইতে রাজি থাকেন, ততদিন ইঁহাদিগকে সকলে মাথায় করিয়া রাখে। কিন্তু মতভেদ উপস্থিত হইলেই ইঁহাদিগকে অবলীলাক্রমে ছাড়িয়া আসিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহাকে প্রকৃত লোকনায়কত্ব বলে না, বা বলা সঙ্গত নহে।

প্রকৃত লোক-নায়ক এদেশে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে। এক সময়ে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে যে জাতীয় লোকনায়ক স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা আর আজ দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষাতে আমাদিগকে দেশের লোকের প্রাণ হইতে ক্রমশঃই যেন দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। প্রথমতঃ আমাদের পিতৃ-পিতামহেরা যে ভাবে আপন আপন গ্রামের সঙ্গে

একাত্ম হইয়া বাস করিতেন, আমরা আর তাহা করি না। তাঁহারাও সময় সময়, বিষয়কর্ম্মের খাতিরে গ্রাম ছাড়িয়া দূরান্তে বাস করিতেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রেরা গ্রামেই থাকিতেন। যেক্ষেত্রে তাঁহারা পরিবার সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থলে যাইতেন সেখানেও গ্রামের সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণগত অন্তরঙ্গ যোগ নষ্ট হইত না। বিদেশে প্রবাসে তাঁহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, গ্রামে আসিয়া আপনার আত্মীয়কুটুম্ব প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গের মধ্যে সে অর্থ ব্যয় করিতেন। পরোক্ষভাবে দশে তাঁহাদের অর্থের ভাগী ও ভোগী হইত; সাক্ষাৎভাবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা সময়ে অসময়ে অনেক সাহায্য লাভ করিত; বিবাহ ও শ্রদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে, দোল দুর্গোৎসবাদি নৈমিত্তিক পূজা পার্ব্বণে, নিত্য দেব-সেবা ও অতিথিসেবার ভিতর দিয়া, গ্রামের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের একটা নিকট সম্বন্ধ জমাট হইয়া যাইত। আর এই জন্য তাঁরা যেখানে যাইয়া দাঁড়াইতেন, শত শত লোকে সেখানে যাইয়া তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইত। তাঁরা যে কাজ করিতে যাইতেন, সকলে সে কাজে রত হইত। তাঁরা যে পথ দেখাইতেন, সকলে বিনা ওজরে, বিনা বিচারে, সে পথ ধরিয়া চলিত। তখন দেশে সত্যকার লোকনেতৃত্ব ছিল। ইঁহারাই সেকালে প্রকৃত লোক-নায়ক ছিলেন।

আর আজ—'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। সেদিন নাই—সে সমাজও নাই। লোকে লেখাপড়া শিখিয়া, যারা লেখাপড়া জানে না তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের, বিজ্ঞের ও অজ্ঞের মধ্যে এককালে এ সাংঘাতিক ব্যবধান ছিল না। গ্রামের বিদ্যাভূষণ বা তর্কসিদ্ধান্ত বা

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে আপামর সাধারণ সকলের অবাধ গতিবিধি ছিল। তাঁহাদের চতুষ্পাঠীতে যখন তাঁহারা শিষ্যমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া ব্যাকরণ বা স্মৃতি বা ন্যায়ের অধ্যাপনা করিতেন, তখন গ্রামের চাষী ও ব্যবসায়ী তাঁহাদের কাছে যাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত এবং তামাকাদি সাজিয়া তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইত। তাঁহাদের সঙ্গে এ সকলের বিদ্যার ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, প্রাণের ব্যবধান বড় বেশি ছিল না। আর এই এক-প্রাণতা নিবন্ধন, দেশের আপামর সাধারণে এ সকল উদারচরিত পণ্ডিতদের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়াও তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে, কথাবার্ত্তার গুণে অনেকটা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিত। এ শিক্ষা স্কুলপাঠশালায় মিলে না। আমরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া, চিন্তায় ভাবে আদর্শে অভ্যাসে সকল বিষয়ে দেশের লোক হইতে এতটা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাদের কথা আমাদের মিষ্ট লাগে না, আমাদের কথাও তাহাদের বোধগম্য হয় না। তাহাদের আমোদ প্রমোদে আমরা গা ঢালিয়া দিতে পারি না; আমাদের উৎসবাদিতেও তাহারা আমাদের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। আমাদের বাড়ীতে তাহারা সাহস করিয়া আসে না, আমরাও আমাদে ক্রিয়াকর্ম্মে তাহাদের আদর করিয়া ডাকি না। ইংরেজকে তাহারা যে ভাবে দেখে, যেরূপ সম্মান করে, আমাদেরও প্রায় সেইরূপ করে। আর এই জন্য দেশের লোকে যেমন ইংরেজের শাসন মানিয়া চলে, কিন্তু আপনা হইতে প্রাণের টানে এই সরকারের অনুবর্ত্তন করে না, আমাদের আন্দোলন-আলোচনাদিতেও এখন দেশের লোক ঠিক ঐ ভাবেই আসিয়া যোগদান করে; —খাতির করে, বড়লোক ভাবিয়া আমাদের 'মাস-মিটিংএ' আসিয়া জনতা করে, কিন্তু আপনার জন বলিয়া, অন্তরের

টানে আমাদের কাছে তাহারা আসে না। এ অবস্থায়, প্রকৃত লোক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব না।

তবে অশ্বিনীকুমারের পক্ষে ইহা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অশ্বিনীকুমার কখনও সাধারণ ইংরেজি-নবিশদের মত জীবনটা কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া কর্ম্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সখের দায়ে, আপনার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন নাই। বরিশালেই তিনি তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বহুদিন পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারের একবার কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রস্তাব হয়, এরূপ শুনিযাছি। প্রবীণ সাহিত্যিক, ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রায়ই দেওঘরে যাইয়া বসু মহাশয়ের সহিত মিলিত হইতেন। অশ্বিনীকুমারের কলিকাতায় আসিবার কথা শুনিয়া রাজনারায়ণ বসু তাঁহাকে এমন আত্মঘাতী কর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন। অশ্বিনীকুমার যদি এ নিষেধ না শুনিতেন, আমাদের দশজনের মতন যদি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেন, তাহা হইলে বাংলার আধুনিক কর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আজ যে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সে স্থান কিছুতে পাইতেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

শিক্ষা প্রচার ও গ্রামের কাজ

প্রথম যৌবনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া অশ্বিনীকুমার বরিশালে যাইয়া স্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। সে সময়ে লাট রিপন প্রবর্ত্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা Local Self Government এর খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ দেশের ব্যবহারজীবিগণ এই স্বায়ত্তশাসনেই দেশের ভবিষ্যতের স্বাধীনতার

পত্তন হইল ভাবিয়া উৎসাহ সহকারে মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রীক্ট্-বোর্ডের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন; অশ্বিনীকুমারও সেই পথ ধরিয়াই নিজের শহরের এবং জেলার সেবাতে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যতদুর আমার মনে আছে, বোধ হয় তিনি বহুকাল ধরিয়া আপনার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। ক্রমোন্নতি সহকারে অশ্বিনীকুমারের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়, এবং অশ্বিনীকুমার একজন মনীষাসম্পন্ন স্বার্থত্যাগী লোকশিক্ষকের খ্যাতি-লাভ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে বিশেষভাবে আমাদের মধ্যে অল্প বেতন লইয়া উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। আজকাল দেশে এ শ্রেণীর অনেকগুলি বে-সরকারী স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রায় অপর সকলেই এগুলিকে জীবিকা উপার্জ্জনের একটি প্রশস্ত উপায়রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহা করেন নাই। সে প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। ফলতঃ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহশেয়ের পরে, অশ্বিনীকুমারের মতন আর কেহ এতটা নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশীয়দের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রচার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই। এই জন্য আজ পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমারের স্কুল ও কলেজের পরিচালনা কার্য্যে কোন প্রকারের ব্যবসাদারীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অশ্বিনীকুমার লোকশিক্ষার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া আপনার সময়, শক্তি এবং অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন, কখনো তাহার এক কপর্দ্দকের প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন নাই। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এ দেশের বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের, শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে

এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরাই পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সাচ্চা স্বদেশীর পুরোহিত হইয়া বসিয়া আছেন। স্বদেশী যে পূর্ব্ববঙ্গে এতটা শক্তিশালী হইয়াছিল এবং এখনো হইয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ অশ্বিনীকুমারের চরিত্র ও শিক্ষা। স্কুল ও কলেজ খুলিয়া বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাবলী পড়াইয়াই যুবকগণের শিক্ষার কাজ শেষ হইল, অশ্বিনীকুমার কখনো এমনটা মনে করেন নাই। ছাত্রদের চরিত্রগঠনের জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। চরিত্র-গঠনের উপর কেবলমাত্র উপদেশ নহে, সদনুষ্ঠান। অশ্বিনীকুমার আপনার স্কুল ও কলেজের যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। চরিত্র-গঠনের মূল পরার্থপরতা সাধন। লোকসেবার ভিতর দিয়া যে ভাবে ও যে পরিমাণে যে পরার্থপরতা সাধন করিতে পারা যায়, আর কোনো উপায়ে তাহা যায় না। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা দল বাঁধিয়া বরিশালে আর্ত্তজনের সেবায় নিযুক্ত হইতেন।

বহু দিন হইতে বরিশালে মাঝে মাঝে বিসূচিকার নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের স্কুল এবং কলেজের যুবকেরা সে সব সময়ে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে পল্লীগ্রাম হইতে বহু লোক সর্ব্বদা বরিশালে যাতায়াত করে। বরিশাল মুসলমান-প্রধান স্থান। শহরের এই সকল অভ্যাগতদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী হয়। ইহারা শহরে আসিয়া মোসাফেরখানায় বা হোটেলে আশ্রয় লইয়া থাকে। এই সকল হোটেলে স্বাস্থ্য রক্ষার কোনো ব্যবস্থা যে নাই, ইহা বলা বাহুল্য; বিশেষতঃ পরিবার পরিজন হইতে দূরে

আসিয়া এরূপ বন্ধুহীন স্থানে বিসূচিকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকের কত না দুর্গতি হয়, ইহা সহজে অনুমান করা যায়। অশ্বিনীকুমারের ছাত্ররা সর্ব্বদা নিতান্ত আপনার জনের মত এই সকল অসহায় রোগীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ সন্তানেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ইহাদের মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ অকাতরে এই সকল বিপন্ন লোকের ঔষধ এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরিশালের এই সেবকদল অনেক বন্ধুহীন লোকের মৃতদেহের সৎকার করিয়াছেন। শহরের বারাঙ্গনাগণ পর্য্যন্ত ইহাদের এই সেবা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা বিপন্ন রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইয়া কোনো দিন কোনো প্রকারের জাতিবর্ণের বিচার করেন নাই। আকালে, অন্নকষ্টে, ইহারা সম্পন্ন লোকদের নিকট হইতে দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করিয়া হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বিপন্ন জনের ক্ষুন্নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন।

অশ্বিনীকুমারের লোক-সেবা কেবল যে শহরে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। বহু দিন হইতে অশ্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে। কতকটা নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, আর কতকটা আপনার বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে তিনি আপনার জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নৌকাযোগে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। এই সকল সময় দেশের গরীব লোকেরা সর্ব্বদা নানা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য এবং সেবা পাইয়া আসিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের নৌকা কোথাও আসিয়াছে শুনিলেই সে স্থানের গরীব লোকেরা আপন আপন শরীর-মনের বোঝা লইয়া নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া

থাকে। রোগী ঔষধ চায়, দরিদ্র অর্থ চায়, জিজ্ঞাসু উপদেশ চায়, আর যাহার চাহিবার কিছু নাই, সেও তাঁহাকে কেবল চক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য তাঁহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হয়। সকলের অভাব বা প্রার্থনা যে তিনি পূরণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। ভগবানের নিকটেও মানুষ সর্ব্বদা কত কি চায়, কিন্তু যাহা চায় তাহাই যে পায়, এমন নহে; তথাপি ইপ্সিত লাভ না হইলেও তাহাদের প্রাণে শান্তিলাভ হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের সম্বন্ধেও কতটা তাই হয়। সকলের প্রার্থনা পূরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত, কোনো মানুষই তাহা পারে না। তবে মিষ্ট কথায়, স্নেহসিক্ত সম্ভাষণে, অন্তরের সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়া প্রতি মানুষই অপর মানুষের প্রাণটা ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারেন। অশ্বিনীকুমার এটী সর্ব্বদাই করিয়াছেন। এই জন্য বরিশালের জনসাধারণের সঙ্গে বহুদিন হইতে তাঁহার একটা গভীর প্রাণের যোগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কি সহজ উপায়ে তিনি লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে অনেক সময় তাহা কল্পনা করিয়া উঠাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটী সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে বেশী দিনের কথা নয়; স্বদেশী আন্দোলনের তখন খুব প্রাদুর্ভাব। বরিশালে একটা অতি বিস্তৃত ও স্বল্পবিস্তর সঙ্গতিসম্পন্ন নমঃশূদ্র সমাজ আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টীয়ান হইয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ লেখাপড়াও শিখিয়াছেন। এই সকল সূত্রে পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রভাবও কিয়ৎপরিমাণে এই নমঃশূদ্র সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। নমঃশূদ্রেরা কোনো বিষয়ে দেশের অপরাপর শূদ্রগণ অপেক্ষা হীন নহেন; অথচ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীর

লোকেরা স্বচ্ছন্দে অপর শূদ্রদের জল গ্রহণ করেন, নমঃশূদ্রের জল গ্রহণ করেন না। নমঃশূদ্রেরা এ জন্য আপনাদিগকে অযথা অপমানিত মনে করিয়া এই প্রথার বিরুদ্ধে একটি প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশী দলে আত্মবিরোধ বাধাইবার জন্য স্বদেশীর বিরোধী-গণ নমঃশূদ্রদের এই আন্দোলনে নানা ভাবে ইন্ধন প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। বরিশালের একজন নিষ্ঠাবান্ স্বদেশসেবক নমঃশূদ্রকে একদিন কেহ বলেন "বাবুরা ত 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া ভাই ভাই একঠাঁই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুঁকা চলে না, তবুও তোমরা তাঁদের ভাই। কথাটা মন্দ নয়।" এ কথা শুনিয়া এই ব্যক্তির মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া যায়। সে সময়ে অশ্বিনীকুমার সেই অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য এই নমঃশূদ্র স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে বসিয়া ছিলেন; শয্যার নিকটেই একটা ফরাশ পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটি অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; অশ্বিনীকুমার অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতি-নমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তার পর অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটী বলিলেন—"বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশ্যক; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। আপনি যখন

আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা কহিয়াছেন তাহাতেই বুঝিয়াছি, 'বন্দে মাতরম্' সত্য; আমরা আপনাদের ভাই।" ঘটনাটি ক্ষুদ্র কিন্তু ইহাতে কি সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে আশ্বিনীকুমার বরিশালে সর্ব্বসাধারণের চিত্তের উপরে আপনার অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মসাধনা

সে কালের অধিকাংশ ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতন প্রথম যৌবনে অশ্বিনীকুমারও ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়াছিলেন। এমন কি এক সময়ে তাঁর যৌবন-বন্ধুরা ভাবিয়াছিলেন যে বুঝি বা অশ্বিনীকুমার প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদ এবং ধর্ম্মের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াও অশ্বিনীকুমার তাহার সমাজ-দ্রোহিতার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিতে পারেন নাই। এই জন্য দেশে ফিরিয়া, পিতার আদেশে খাঁটি হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। আমি যতদূর জানি, মত ও বিশ্বাসে অশ্বিনীকুমার এখনও অনেকটা ব্রাহ্মভাবাপন্নই হইয়া আছেন; কিন্তু এ সত্ত্বেও বোধ হয় এপর্য্যন্ত প্রচলিত হিন্দুসমাজের নিতান্ত বিরোধী কোন আচার ব্যবহারে লিপ্ত হন নাই। খাদ্যাখাদ্য ও আচার-বিচার সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই উদার হিন্দুর মতন জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারকে যাঁরা পছন্দ করেন না, তাঁরা ইহাকে তাঁর কাপুরুষতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করেন। তাঁর বন্ধুরা বলেন, অশ্বিনীকুমার নিতান্ত সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীরু বলিয়াই সমাজবিধি মানিয়া চলেন। আমার মনে হয় যে, যে উপাদানে দ্রোহী-চরিত্র রচিত হয়, অশ্বিনীকুমারের মধ্যে

সে বস্তু কোন দিন ছিল না। থাকিলে তিনি যেমনটি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন ও যেমন কাজটী করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

একটা ছবির মধ্যে যেমন আলো ও ছায়ার যথাযোগ্য সমাবেশে তার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, মানুষের চরিত্রেও সেইরূপ ভালমন্দ মিশিয়া তার বিশিষ্টতাকে গড়িয়া তোলে। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে যে কিছু দুর্ব্বলতা লোকে লক্ষ্য করে, তাহার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের অনন্যসাধারণ শক্তিও অতি ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া আছে। এক্ষেত্রে মন্দটুকুকে ছাঁটিয়া ভালটুকু রাখা সম্ভব হয় না। দ্রোহিতা মাত্রেই প্রবল রাজসিকতার ফল। সমাজ সংস্কারকেরা সকলেই রাজসিক স্বভাবের লোক। এমন কি পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বা অবতার নবযুগধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁদের সকলকেই স্ব-কার্য্য সাধনের জন্য এই রাজোধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই রাজসিকতা হইতে সর্ব্বপ্রকারের আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা আসে। আর সংস্কার, বিদ্রোহ, সকলই এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে কোনদিন এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার বা এই সংগ্রামশীলতার বা এই প্রখর রাজসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এগুলি থাকিলে তাঁর চরিত্র এমন মোলায়েম ও তাঁর জীবন-ব্রত এতটা সফল হইতে পারিত না।

অশ্বিনীকুমার প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত না হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতাই ব্রাহ্মমতের মূল ভিত্তি। এই দুইটি সিদ্ধান্তকে আশ্রয়

করিয়া ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের প্রকৃতিগত আস্তিক্যবুদ্ধি বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিয়াছে। আর এই যুক্তিবাদ ও অনধীনতার আদর্শ উভয়ই ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। ইংরেজি শিখিয়া আমরা সকলেই এগুলি দ্বারা একদিন অল্পবিস্তর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অশ্বিনীকুমারও এ প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে অন্তর্দৃষ্টি জাগিতে আরম্ভ করিলে এবং সংসারের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়া সকল বিষয়ে চারিদিক অনুধাবন করিবার শক্তি জন্মিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকে প্রথম যৌবনে এই নিরঙ্কুশ অনধীনতা ও যুক্তিবাদের প্রভাব হইতে অল্পবিস্তর মুক্ত করিয়া দিতে থাকে।

প্রথম যৌবনে আমরা নিজেদের বিচার বুদ্ধিকে সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই যে এ পথে যাইলে বস্তুতঃ সত্যে ও মতে কোন পার্থক্য থাকে না, আর ধর্ম্মের ও সত্যের কোন সনাতন সার্ব্বভৌমিক প্রতিষ্ঠাও মিলে না। আমার বিচার-বুদ্ধি যদি সত্যাসত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর হয়, তবে তোমার বিচার-বুদ্ধিই বা তাহা হইবে না কেন, ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। এ পথে য়ুরোপে ক্রমে একটা মানসিক অরাজকতা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই কারণে সেখানে সমাজবন্ধন ও রাষ্ট্রবন্ধন উভয়ই শিথিল হইয়া আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার মূল ভিত্তিকে পর্য্যস্ত বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে। অশ্বিনীকুমার বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করেন। আর তদবধি তাঁর ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন উভয়ই এক অভিনব পথ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

এই সদ্‌গুরু তত্ত্বটী যে কি ইহা এখনও আমাদের নব্য শিক্ষিত সমাজ ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। গতানুগতিক পন্থা অবলম্বনে যাঁরা গুরুকরণ করিয়া এদেশে ধর্ম্ম সাধন করেন, তাঁরাও কেবল নিষ্ঠাগুণে কোন কোন স্থলে সাধনপথে বিশেষ অগ্রসর হইয়াও, প্রকৃত গুরুকরণ ও গুরু-শক্তিকে তাঁরা একটা অতিলৌকিক ও অতি-প্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া মনে করেন ; আর গুরুনির্ব্বাচনেও প্রায় কোন প্রকারের বিচার বিবেচনা করেন না। অধিকাংশ লোকে কুল-গুরুকেই সদ্‌গুরু বলিয়া মনে করেন, অপর কেহ কেহ বা কুল-গুরু ত্যাগ করিয়া কোন সাধুপুরুষের নিকটে দীক্ষা লইয়া, দীক্ষা-গুরুকেই সদ্‌গুরু বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুল-গুরু বা দীক্ষা-গুরু এঁদের দু-এর কেহই সদ্‌গুরু নহেন। কুল-গুরুতে আর সদ্-গুরুতে যে প্রভেদ অনেক, একথা আজকাল একটু আধটু ধর্ম্ম-চর্চ্চা যাঁরা করেন, তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন। জন্মনিবন্ধন যে কেহ অপরের ধর্ম্মপথের সহায় ও নায়ক হইতে পারেন না, এই মোটা কথাটা এদিনে আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। শিক্ষিত লোকেরা এখন আর কুল-গুরু গ্রহণ করেন না ; অধিকাংশ লোকে কোন গুরুই গ্রহণ করেন না ; যাঁরা করেন তাঁরা কোন সাধুসন্তের নিকটে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া ধর্ম্মসাধন করিবার চেষ্টা করেন। দীক্ষা-গুরু কুল-গুরু অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইলেও কেবল ধর্ম্মসাধনেই তিনি শিষ্যের সহায় হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপ্রকট বা অব্যক্ত ভগবদ্বস্তুকে আত্মপ্রভাবে শিষ্যের অন্তরে প্রকট বা ব্যক্ত করিবার অধিকার তাঁরও নাই। দীক্ষাগুরু সাধক বা সিদ্ধপুরুষ হইতে পারেন, তিনি পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি-প্রভাবে শিষ্যের চিত্তকে

অধিকার করিয়া তাঁহার অন্তরে সাধনের ও ভক্তির প্রেরণা করিতে পারেন, কিন্তু সাধ্য-বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারেন না। এটী কেবল সদ্‌গুরুরই কর্ম্ম। আর এই জন্য সদ্‌গুরুকে লোকে ও শাস্ত্রে ভগবানের বিগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। কুল-গুরু বা দীক্ষা-গুরুর এই অধিকার নেই। এক অর্থে মানুষ মাত্রই মানুষের গুরু; আর কেবল মানুষই বা বলি কেন, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদির নিকটও মানুষ কত শিক্ষালাভ করে বলিয়া তাহারাও গুরুপদবাচ্য। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—জড় জীব সকলেই এক অর্থে ভগবানের প্রকাশও বটে; সকলেই সেই অব্যক্তকে নিয়ত ব্যক্ত করিতেছে। সকলেই তাঁর অবতার। কিন্তু এইরূপ ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে সদ্‌গুরুকে ভগবানের বিগ্রহ বলা যায় না। ঈশ্বর নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ। তিনি আমাদের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে রহিয়াছেন। তিনি পরমাত্মা, তিনি সর্ব্বাত্মা, তিনি বিশ্বাত্মা। কিন্তু জীব তাঁহাকে দেখে কই? সকল জ্ঞানকে যিনি উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, জ্ঞান তাঁহাকে ধরিতে পারে না। পারে না এই জন্য যে তিনি জ্ঞানের মূলেই আছেন, জ্ঞানের বিষয়রূপে, জ্ঞেয়রূপে সকলের প্রত্যক্ষ হন না। ভগবান্ সদ্‌গুরুরূপেই জীবের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। যিনি অন্তর্যামী, তিনিই সদ্‌গুরু। ভাগবত ভগবানকেই আচার্য্য বলিয়াছেন—আচার্য্যকে মনুষ্যজ্ঞানে কখনো অসূয়া করিবে না। আর দ্বিবিধরূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান্ জীবের সর্ব্বপ্রকারের অমঙ্গল নিরস্ত করিয়া, তাহার সদ্গতি করিয়া থাকেন। ইহার এক অন্তর্যামী রূপ, আর এক মোহান্ত বা সদ্‌গুরু রূপ। কেবল অন্তরবৃত্তি বা আত্মপ্রত্যয় বা সহজ জ্ঞান বা ইনটুইশণের দ্বারা আমরা কোন জ্ঞানলাভ বা রসাস্বাদন করি না। অন্তরে যার ছাঁচ আত্মপ্রত্যয়রূপে রহিয়াছে,

তার অনুরূপ বস্তু যতক্ষণ না বাহিরে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ অন্তরের সেই আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে না। ভিতরের ঐ ছাঁচে বাহিরের বস্তু পড়িলেই আমাদের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অন্তরের ঐ আত্ম-প্রত্যয়কে ইংরেজিতে subjective intuition বলে, কেবল intuitionও বলিয়া থাকে। আর বাহিরের বস্তুকে object বলে। ইনটুইশণ বা আত্মপ্রত্যয়কে 'form of knowledge' আর বাহিরের বিষয়কে 'contents of knowledge' বলে। এই ছাঁচের বা form এর সঙ্গে এই contents বা বস্তুর মিলন হইয়া সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। আমাদের সদ্‌গুরু তত্ত্ব এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে ঈশ্বরের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়রূপে আছে, ইহা সত্য। কিন্তু এ জ্ঞান আমাদের গোচর নহে। যখন বাহিরে ঈশ্বরের ধর্ম্মসম্পন্ন কোন বস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করি, তখনই কেবল আমাদের ভিতরকার ঐ ঈশ্বরজ্ঞান জাগিয়া উঠে। বাহিরে সংসারে পিতাকে দেখিয়া ভগবানের পিতৃত্ব, এখানে মাতাকে দেখিয়া তাঁহার মাতৃত্ব, এখানকার সখাসখীদের সখ্য আস্বাদন করিয়া তাঁহার সখ্য, এখানকার মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়া তাঁহার মাধুর্য্যের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এ সকল জ্ঞান ভিতরের বস্তু বটে, কিন্তু বাহিরের সংস্পর্শ লাভ না করিলে এই ভিতরের জ্ঞান জাগে না। এই জন্য 'যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে'—একদিকে যেমন এই কথা অতি সত্য সেই রূপ অন্যদিকে, 'যাহা দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে তাহা জাগে না ভাণ্ডে', এই কথাও ঠিক ততটা সত্য। ভাণ্ড সত্যের আধখানা, ব্রহ্মাণ্ড তার অপরার্দ্ধ। এই দুই'এতে সত্য পূর্ণ ও প্রকট হয়। এখন প্রশ্ন এই—ভগবান্‌কে আমরা জানিতে পারি, না জানিতে পারি না।

কেবল অন্তর্য্যামীরূপে তাঁহাকে জানিলে, তার আধখানা মাত্র জানা হয়। ফলতঃ বাহিরে তাঁর যে সকল প্রকাশ হয় ও হইতেছে, সেগুলিকে ছাড়িয়া তাঁর অন্তর্যামীরূপে কোন সত্য ও অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে আমাদের যে সদাসদ্জ্ঞান বা ধর্ম্মবুদ্ধিকে তিনি জাগাইয়া দেন, তার সঙ্গে বাহিরের বিষয়-রাজ্যের সমাজ-জীবনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী। আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম আমরা যে সমাজে বাস করি, বা যে সকল বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হই, তারই আশ্রয়ে ফুটিয়া থাকে। বাহিরে যার প্রকাশ হয় না, ভিতরে তার জ্ঞান জাগে না, জাগিতে পারে না। ভগবানকে বাহিরে দেখিলে তবে ভিতরে তাঁর সত্য জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। এই জন্য ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ যে সকল মহাপুরুষের মধ্যে হয়, তাঁহারাই জগতে সকল ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইয়া রহেন। ইহাই অবতারের মূল অর্থ ও মুখ্য প্রয়োজন। ইহাই সদ্গুরু তত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠা। যাঁহার মনে শিষ্যের অন্তরের আত্মপ্রত্যয়নিহিত ভগবদ্ভাব ও ভগবদাদর্শ প্রকট হইয়া, তাহার ভক্তি ও আনুগত্যকে একান্তভাবে টানিয়া লয়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সদ্গুরুপদবাচ্য। তাঁহাকে দেখিয়াই শিষ্য ও সাধক, আপনার সাধ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ লাভ করেন। অবতারেরা যুগে যুগে প্রকাশিত হন, সদ্গুরুতে ভগবান্ নিত্য অবতীর্ণ। এই সদ্গুরু তত্ত্বতেই স্বাধীনতা ও আনুগত্যের, স্বানুভূতি ও শাস্ত্রের মত ও সত্যের, আত্মপ্রত্যয় ও বিষয় প্রত্যক্ষের, সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া থাকে। এখানেই সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় হয়। অশ্বিনীকুমার প্রথম যৌবনে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া সদ্গুরুচরণাশ্রয় পাইয়াই ক্রমে স্বাধীনতার

সঙ্গে আনুগত্যের সমন্বয় পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন।

অশ্বিনীকুমার এই উদার ও গভীর গুরুতত্ত্ব বুঝিয়া, পরে গুরুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয় না। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে অতি অল্প-লোকেই এই তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ আমরা আজকাল যেরূপ শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া থাকি, তাহাতে এই গভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কিছুতে সহজ নহে। এই তত্ত্ব গুরুগ্রহণের পরে, গুরু-কৃপাতেই কেবল ক্রমে ক্রমে শিষ্যের প্রাণে ফুটিয়া উঠে। একালে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই সাধু মহাপুরুষ বিশেষের উন্নত ও উদার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁদের শরণাপন্ন হন। অশ্বিনীকুমারও, বোধ হয়, এই ভাবেই তাঁর গুরুদেবের চরণে যাইয়া প্রথমে উপস্থিত হন। একদিকে তাঁর সহজ ধর্ম্মপিপাসা মামুলি ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপকোপাসনা ও মানস-কল্পিত সাধনভজনে মিটাইতে পারে নাই; অন্যদিকে মামুলি ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তের যুক্তিবাদ সত্যের সম্যক্ প্রামাণ্যও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। আর এই দ্বিবিধ অভাব পরিপূরণের আশাতেই, বোধ হয়, অশ্বিনীকুমার গুরুগ্রহণ করেন। প্রথম যৌবনে, ইংরেজী শিক্ষার ও য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের বা র‍্যাশনিলিজমের (Rationalism) প্রভাবে যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আসিয়া, পরে গুরুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁদের প্রায় সকলের ভিতরকার কথা ইহা। অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনের কাহিনী যে অন্যরূপ, এরূপ অনুমানের কোনো হেতু আছে বলিয়া বোধ হয় না। আর এই পথে আসিয়া গুরুগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, অশ্বিনীকুমার একেবারে যে আমাদের দেশের প্রাচীন গুরুতত্ত্বটী পূর্ণমাত্রায় বুঝিয়াছিলেন, এমন কল্পনা করা কঠিন।

সদ্‌গুরু তত্ত্ব

সদ্‌গুরুতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, গুরুর চরণে একান্ত আত্মসমর্পণ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যিনি অন্তর্যামী তিনিই সদ্‌গুরু। অন্তরে যাঁর প্রেরণা জাগে, বাহিরে তিনিই আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া, সেই প্রেরণার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এই কথাই আমাদের দেশের পুরাতন গুরুতত্ত্বের মূল কথা। এই কথাটা বুঝিলে, আত্মপ্রত্যয়ের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া, আর শ্রীগুরুর হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া দুই এক হইয়া দাঁড়ায়। ভিতরে যিনি ধর্ম্মাবহ, অন্তরে আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির ভিতর দিয়া যিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে ভালমন্দের উপদেশ দান করেন, তিনিই যখন বাহিরে, চাক্ষুষ মোহান্ত গুরুরূপে প্রকাশিত হন, তখন এই গুরুর আদেশ আর ইংরেজিতে যাহাকে কনস্যান্স (Conscience) এবং আমাদের আধুনিক বাংলা ভাষায় যাহাকে বিবেক বলে, এই উভয়ই এক হইয়া যায়। সুতরাং বিবেক-বাণী আর গুরুবাক্য সমান মর্য্যাদা ও প্রামাণ্য প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত গুরুতত্ত্ব এই কথাই বলে। তবে ভিতরের conscience বা বিবেক-বাণী আর বাহিরের গুরুবাক্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, কোনটা বলবত্তর হইবে, একথা ওঠে বটে। সদ্‌গুরু-তত্ত্ব বলে, এরূপ বিরোধ অসম্ভব। ফলতঃ সদ্‌গুরু কে আর সদ্‌গুরু কে নহেন, এখানেই তার প্রকৃত পরীক্ষাও হইয়া থাকে। সদ্‌গুরু স্বয়ং অন্তর্য্যামী। তিনি শিষ্যের অন্তর জানেন; কেবল ইহাই নহে, তার অন্তরে যে সকল প্রেরণা জাগে তারও প্রেরয়িতা তিনি আপনি। শিষ্যের অন্তরে তিনিই জিজ্ঞাসার উদয় করান, আবার বাহিরে মোহান্তরূপে বা আচার্য্যরূপে তিনিই শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়া, সে

জিজ্ঞাসার নিষ্পত্তি আপনিই করিয়া থাকেন। কোন্ পথে, কি ভাবে, শিষ্যের জীবন ফুটিয়া উঠিয়া, ক্রমে সে চরম সাধ্য লাভ করিবে ইহা তিনি জানেন ; জানিয়া সেই পথে অন্তরের প্রেরণা ও বাহিরের উপদেশাদি দ্বারা তিনি তাহাকে অলক্ষিতে লইয়া যান। এই প্রকৃত গুরুপন্থা ত্রিগুণাতীত। এপথে সংসারের লৌকিক ভালমন্দের বাহ্য বিচার বিধানের প্রয়োগ চলে না। লৌকিক বিচারে যাহা নিতান্ত মন্দ, তার ভিতর দিয়াও নিয়তই ত মানুষ জীবনে অদ্ভুত ভাব ফুটিয়া উঠে। গুরুতত্ত্ব যাঁরা মানে না, তাঁরাও ত এই কথাটা অস্বীকার করেন না। মানুষ মন্দ করে, পাপ করে, অশেষবিধ অহিতাচারে নিযুক্ত হয়, অথচ ভগবান্ সেই মন্দের, সেই অহিতের, সেই পাপের ভিতর দিয়াই, অপূর্ব্ব কৌশলে, অযাচিত করুণাগুণে, তাহাকে কল্যাণের ও পুণ্যের পথে লইয়া গিয়া দাঁড় করান, একথা সকলেই কহেন। হয় বলিতে হয় যে এ সকল স্থলে ভগবানের বিশেষ বিধান সার্ব্বজনীন কার্য্যকারণ সম্বন্ধকে বাতিল করিয়া পাপীর মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দেয়, না হয়, ঐ মন্দের মধ্যেই এই ভালর, ঐ পাপের ভিতরেই এই পুণ্যের বীজ লুকাইয়া ছিল ইহা স্বীকার করিতে হয়। পাপ পাপই প্রসব করে ; পুণ্য হইতে পুণ্যই উৎপন্ন হয় ;—যুক্তি ও নীতি এই কথা বলে। আর ইহাই যদি এ ক্ষেত্রে শেষ কথা হয়, তাহা হইলে খৃষ্টিয়ানী অনন্ত নরকবাস, কিম্বা বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ ভিন্ন আর কোনো কিছুর প্রতিষ্ঠা হয় না। আর নরকবাদ বা কর্ম্মবাদ, উভয়ই ভগবতী করুণাকে সঙ্কুচিত ও অসমর্থ করিয়া রাখে। যাঁরা ভগবানের করুণায় বিশ্বাস করেন, তাঁরা মন্দের ভিতর দিয়া ভাল, অকল্যাণের ভিতর দিয়া কল্যাণ, পাপের ভিতর দিয়া পুণ্যের প্রকাশ হয়, এই কথা সর্ব্বদা

মানিয়া লন। আর এই সত্যকে প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই, আমাদের ভাল-মন্দ সকল প্রেরণাই অন্তর্যামী পুরুষ হইতে আসে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভাল-মন্দের ভেদাভেদ থাকিতে পারে না। সে দৃষ্টি সমদৃষ্টি। সে ভাব দ্বন্দ্বাতীত। আর সুখ-দুঃখ যেমন দ্বন্দ্ব, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য এগুলিও সেইরূপ দ্বন্দ্ব। সম্যক্ দৃষ্টির নিকটে সুখ আর দুঃখ দুই'ই একই বস্তুর দুইদিক মাত্র, সেইরূপ ভাল এবং মন্দও এক বস্তুর দুই দিক ভিন্ন আর কিছু নহে। আজ যাহা মন্দ, কাল তাহা ভাল হয়। আজ যাহা ভাল, কাল তাহা মন্দ হইয়া পড়ে। দেশ, কাল, পাত্রের বিভিন্নতা দ্বারা এসকল ভাল-মন্দের বৈষম্য ও বিচার হইয়া থাকে। ফলতঃ যাহাকে conscience বা ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেকবাণী বলি, তাহাও ত সর্ব্বদা এক কথা কহে না। এই ধর্ম্মবুদ্ধিও বিকাশ হয়। এই ধর্ম্মবুদ্ধিও আজ এক কথা, কাল এক কথা বলে। সুতরাং গুরু আজ যাহাকে যে উপদেশ দান করেন, কাল যদি তাহাকে অন্যতর উপদেশ দেন, অথবা একজনকে যাহা আদেশ করেন, অন্যকে যদি তার বিপরীত আদেশ করেন, তাহাতে তাঁর উপদেশের মর্য্যাদা বা প্রামাণ্য নষ্ট হয় না ও হইতে পারে না। ফলতঃ প্রকৃত সদ্‌গুরুর উপদেশের সঙ্গে শিষ্যের অন্তর্গত প্রেরণার কখনো কোন গুরুতর বিরোধ হয় না ও হইতে পারে না। হয় না এই জন্য যে তিনি ঐ অন্তর দেখিয়াই উপদেশ করেন। যে উপদেশ শিষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে না, এমন উপদেশ করিয়া সদ্‌গুরু কদাপি শিষ্যকে বিব্রত ও অপরাধী করেন না। বরং তিনি তার অন্তরে অন্তর্যামিরূপে যে ভাব বা যে আকাঙ্খা বা যে জিজ্ঞাসা জাগাইয়া দেন, বাহিরে মোহান্তরূপে সেই ভাবের,

আকাঙ্খার বা জিজ্ঞাসার উপযোগী উপদেশ দিয়া তাহাকে ধর্ম্মপথে লইয়া চলেন।

কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে যে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। এইজন্য আমরা সদ্‌গুরু দেহধারী মানুষ বলিয়া, তিনিই যে আবার অন্তর্যামীও, একথা কিছুতে ধারণা করিতে পারি না। আর এই অক্ষমতা-নিবন্ধনই সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়াও আমরা একান্তভাবে গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। অশ্বিনীকুমারও এটি পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার গুরু যে কেবল বাহিরের উপদেষ্টা নন, কিংবা তাঁর গুরুকৃপা যে একটা অলৌকিক উপায়ে ভগবানের শক্তি ও দয়াকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁর কল্যাণ সাধন করে না, অপিচ ভগবানের যে ঐ গুরুদেবকে আশ্রয় করিয়া, 'চৈত্তাবপুষা'—অন্তর্যামিরূপে ও মোহান্তরূপে ভিতর বাহিরে দুইদিকে তাঁহার জীবনকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন, এ সকল কথা তিনি ভাল করিয়া ধরিয়াছেন কি না সন্দেহ। আমাদের কাহারো এ পর্যন্ত এ ভাগ্য হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়া আমরা সংসার তরঙ্গে পড়িয়া দিবানিশি এমন হাবুডুবু খাইয়া থাকি।

খৃষ্টীয় নীতিবাদ

অশ্বিনীকুমার এ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় নীতিবাদকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি খৃষ্টীয়ান সাধকের চক্ষেই তাঁর গুরুকে দেখেন, প্রকৃত হিন্দু সাধকের চক্ষে দেখিতে শিখেন নাই। আধুনিক খৃষ্টীয়ানেরা যিশুখৃষ্টকে গুরুরূপে বরণ করেন। এই গুরু-খৃষ্টবাদ আর আমাদের সদ্‌গুরুতত্ত্ব মূলে একই সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দু'এতে প্রভেদ বিস্তর। কোনো হিন্দু আপনার

গুরুকে জীবনের আদর্শরূপে বরণ করেন না। খৃষ্টীয়ান সাধকেরা যিশুকে তাঁহাদের জীবনের আদর্শ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিশুর অনুকরণ করা আধুনিক খৃষ্টীয়ান সাধকের মুখ্য চেষ্টা। যিশু-চরিত্র লাভ এই সাধনার চরম সাধ্য। কিন্তু হিন্দু সাধক কোনোদিন ভগবান্‌কে বা আপনার গুরুকে অনুকরণ করেন না। ভগবান্‌কে তাঁহারা ভক্তি করেন, গুরুর উপদেশ তাঁহারা পালন করেন, কিন্তু ভগবান্‌কে বা গুরুকে আপনাদের জীবনের আদর্শরূপে কোনও দিন কল্পনা করেন না। তাঁহারা অধিকারীভেদ মানেন। জীবের অধিকার এক আর ভগবানের অধিকার অন্য। শিষ্যের অধিকার এক আর গুরুর অধিকার অন্য। ভগবান্ বিশ্বে কতভাবে লীলা করিতেছেন। তিনি সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন, বিনাশ করেন, সকলই করেন। তিনি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে নির্ম্মমভাবে নষ্ট করেন; তাঁর শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পাপী পাপ করে; আবার পুণ্যাত্মারা সেই শক্তির প্রেরণাতেই পুণ্যকর্ম্ম করেন। এ সকলই তাঁহার দ্বারা হইতেছে। জীবের পক্ষে ভগবচ্চরিত্র লাভ কেবল অসাধ্য যে তাহা নয়, ভগবানের অনুকরণের ইচ্ছামাত্র মহাপাপ। সদ্‌গুরু সম্বন্ধেও ঐ কথা। সদ্‌গুরু ভাগবতী তনু লাভ করিয়া ভগবল্লীলা রসে নিমগ্ন হইয়া, কত প্রকারের আপাত বিসদৃশ কথা বলেন ও কর্ম্ম করেন। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে তাঁহারা বিভিন্ন উপদেশ দেন। একজনকে যাহা বিহিত ও ভাল বলিয়া আচরণ করিতে বলেন, অন্যজনকে তাহা মন্দ ও অবিহিত বলিয়া বর্জন করিতে উপদেশ দেন। এ অবস্থায় শিষ্যের পক্ষে আপনার অধিকারকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া গুরুর অনুসরণ করা অসম্ভব। এরূপ প্রয়াসেও গুরুতর অপরাধ হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা এ সকল নিগূঢ়

কথা ভাল করিয়া ধরিতে পারে না। আমাদের নীতিবাদ সকল মানুষকে ভগবচ্চরিত্র লাভ করিতে উপদেশ দেয়। কিন্তু গুরুর অনুকরণ করা নহে, অনুগত হওয়াই শিষ্যের ধর্ম্ম। হিন্দু শিষ্য সেজন্য কেবল এই বলিয়া প্রার্থনা করেন—

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া যে সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমরা একালে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া থাকি, তাহা দ্বারা হিন্দুর এই সদ্‌গুরু-তত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম ও রহস্য ভেদ করা সহজ নহে।

খৃষ্টীয়ান সাধনাতেও এই তত্ত্ব যে একেবারে ফুটিয়া উঠে নাই তাহা নহে। বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে এই তত্ত্বের উপরেই খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান যখন অতিলৌকিক শাস্ত্রের প্রাচীন প্রামাণ্য নষ্ট করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বকে মানুষের সহজবুদ্ধি বা আত্মপ্রত্যয় বা ইন্‌টুইশনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিল তখন খৃষ্টীয়ান দার্শনিকেরা এই আত্মপ্রত্যয়বাদের অপূর্ণতা দেখাইয়া, এই আত্মপ্রত্যয়কে পূর্ণ করিবার জন্যই যিশুখৃষ্টকে ভগবানের বহিঃপ্রকাশ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। বাহিরে সত্যের প্রকাশ না হইলে ভিতরে তার যে সহজ জ্ঞান রহিয়াছে তাহা ফোটে না ও জাগে না, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের একটা সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয় আমাদের

প্রকৃতির ভিতরে, প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে ইহা যেমন সত্য, যতক্ষণ বাহিরে বিষয় রাজ্যে কোনো বিশেষ কারণ হইতে একটা বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে না দেখা যায়, ততক্ষণ এই আত্মপ্রত্যয় যে জাগে না, ইহাও তেমনি সত্য। এ কথা আগেই বলিয়াছি। অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল একটা আত্মপ্রত্যয় আছে, ইহা মানিলেই ঈশ্বরসত্তার প্রতিষ্ঠা হয় না। এই আত্মপ্রত্যয়কে জাগাইবার জন্য তাহার উপযোগী বহির্বিষয়ের প্রকাশও অত্যাবশ্যক হয়। কেবল মনোগত অস্তিক্যবুদ্ধিতে ভগবৎ-প্রতিষ্ঠা হয় না। ভগবান্‌কে বাহিরেও দেখিতে হয়। এই জন্যই তাঁহার অবতারের প্রয়োজন। অবতার ব্যতীত সত্য ও প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। যিশুখৃষ্ট মানুষের ঐশ্বরিক আত্মপ্রত্যয়ের বহির্বিষয়রূপে প্রকট হইয়া ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই ভাবেই বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর উদার ও উন্নত য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান আত্মপ্রত্যয়বাদের সঙ্গে অবতারবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া ধর্ম্মের অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্যকে সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। আর এখানে এই আধুনিক খৃষ্টতত্ত্ব আমাদের পুরাতন সদ্‌গুরু-তত্ত্বের সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া গিয়াছে। আধুনিক উন্নত খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তে যিশুখৃষ্টই সদ্‌গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা যে খৃষ্টীয়ান সিদ্ধান্তের কথা সচরাচর এদেশে শুনিতে পাই, তাহাতে এসকল গভীর কথার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মামুলি খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মে এ তত্ত্ব এখনও ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে নাই। প্রচলিত য়ুরোপীয় দর্শনাদিতেও এই সত্যটা এখনও পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং আমরা ইংরেজি শিখিয়া ইহার কোন পরিচয় পাই না। আমাদের

আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা এখনও খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে।

খৃষ্টানুসরণ

খৃষ্টীয় সমাজেও এখন অনেক লোকে যিশুখৃষ্টকে কেবল একজন আদর্শ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিছুদিন হইতে এই ভাবটা য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টেতে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ অপেক্ষা আপনার সাধনবলে খৃষ্ট-চরিত্রের অনুশীলন ও অনুকরণ করিয়া ঐ উদার ও বিশুদ্ধ চরিত্রলাভ এখন খৃষ্টীয় সাধনের সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টীয়ান সাধু ও সাধকেরা আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে এখন—'যিশু এই অবস্থায় কি করিতেন ?'—এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া থাকেন; আর তিনি যাহা করিতেন, যেরূপ চলিতেন, তাহা করিতে ও সেরূপ চলিতে চেষ্টা করেন।

অশ্বিনীকুমারও, আমার মনে হয়, কতকটা এভাবে আপনার গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনার ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিস্তৃত কর্ম্মজীবনে যখনই যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তখনই—এ অবস্থায় তাঁহার গুরুদেব কি করিতেন, তিনি এই প্রশ্ন তুলিয়া, তার যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়াছেন। আর এই জন্য সময় সময় লোকে তাঁর কর্ম্মজীবনে কতকটা দুর্ব্বলতা, এমন কি অব্যবস্থিততা এবং অসামঞ্জস্যের পরিচয় পাইয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছে।

হিন্দুর নিকটে ইহা গুণের কথা না হইয়া, অত্যন্ত দোষের কথাই হয়। হিন্দুর সাধনার একটা অতি মামুলি কথা আছে যে দেবতাদের

উপদেশেরই অনুসরণ করিবে, কদাপি তাঁহাদের কর্ম্মের অনুকরণ করিবে না। আমাদের বিদেশী ভাবাপন্ন বিচার-বুদ্ধি প্রায়ই এ কথাটাকে উপহাসাস্পদ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। কখনো কখনো ইহাকে অতিশয় হীন বাক্য বলিয়াও ঘৃণা করিয়া থাকে। ইংরেজি প্রবাদ বাক্যে বলে উপদেশ অপেক্ষা আচরণ শ্রেষ্ঠ। এই হিসাবে দেবতাদের আচরণ যদি ধর্ম্মবিগর্হিত হয়, তবে তাঁহাদের আদেশের বা উপদেশের কোনো মূল্য ও সত্য থাকে না। কিন্তু য়ুরোপীয় সাধনা আমাদের অধিকারীভেদ মানে না। অথচ এই অধিকারীভেদই হিন্দুর সাধনার মুখ্য কথা। আমাদের সকল সাধনভজন, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিধিনিষেধাদি এই অধিকারীভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য দেবতার অধিকারে যা সাজে ও যাহা ধর্ম্ম, মানুষের তাহা সাজে না, মানুষের পক্ষে তাহা অধর্ম্ম। ঈশ্বরকে মানুষের আদর্শ করিলে, সমাজধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম সকলই উলট্‌পালট্‌ হইয়া যায়। হিন্দু একেশ্বরবাদী ; অদ্বৈততত্ত্বের উপরে হিন্দুর সকল সিদ্ধান্তের ও সাধনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, শাক্ত, শৈব, সকল সিদ্ধান্তই কোনো না কোনো আকারে এই অদ্বৈততত্ত্বকে মানিয়াছেন। আর মূলতত্ত্ব এক বলিয়া বিশ্বের বহুধা প্রকাশের বা অভিব্যক্তির মধ্যে আপাতঃ বিরোধ ও বৈষম্য যাই থাকুক না কেন, মূলে একটা সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য আছেই আছে। একান্ত ভাল বা একান্ত মন্দ, একান্ত পাপ বা একান্ত পুণ্য বলিয়া কোনো কিছু জগতে নাই। এক ক্ষেত্রে যাহা ভাল অন্য ক্ষেত্রে তাহা মন্দ। এক অবস্থায় ও এক অধিকারে যাহা পাপ, অন্য অধিকারে তাহা পাপ নহে। এ সকল কথা হিন্দু সাধনার গোড়ার

কথা। সুতরাং মানুষের পক্ষে যাহা পাপ, দেবতার পক্ষে তাহা দোষাবহ হয় না। জগতের সকল কর্ম্মের মূল কর্ত্তা যখন ঈশ্বর, তখন সকল কর্ম্মাকর্ম্মই তাঁহার কৃত। তিনি আদি কারণ, তিনি অনাদি কারণ। তিনি সর্ব্ব কারণ। কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকলেরই মূল ও কর্ত্তা তিনি। এ অবস্থায় তিনি জীবের আদর্শ হইতে পারেন কি? মানুষ ভগবানের অনুকরণ করিতে গেলে, তার ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই লোপ পায়। এইজন্য হিন্দু এমন কথা কখনো বলে না। হিন্দু ভগবান্‌কেও যেমন আপনার জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে না, তার গুরুকেও সেইরূপ রূপে ভাবে না। গুরুর উপদেশই মান্য, তাঁর কর্ম্ম অনুকরণীয় নহে। শিষ্যকে তার আপন অধিকার মত তিনি চালাইয়া লইয়া যান, আর নিজে আপনার অধিকার মত চলিয়া থাকেন। ভাগবতী তনু লাভ না করিলে কেহ সদ্‌গুরু হইতে পারেন না। আর যাঁহারা ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সংসারে ভগবানের লীলা-বিগ্রহ রূপে বিচরণ করিয়া জীবকে ভগবানের দিকে লইয়া যান, স্বয়ং ভগবানের চরিত্র যেমন প্রাকৃতজনের অনুকরণীয় নহে, তাঁহাদের চরিত্রও সেইরূপ লোকের অনুকরণীয় হয় না। খৃষ্টীয় দশ-আজ্ঞার মাপকাটি দ্বারা এ সকল লোকোত্তর মহাপুরুষের চরিত্রের কালি করা যাবে না। লৌকিক নীতির বন্ধনে তাঁহারা আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা নিজেরাই এ সকল নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুচরণে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারা ভিতরে যে প্রেরণা প্রেরণ করেন ও বাহিরে যে সকল ব্যবস্থা ও ঘটনার যোগাযোগ সাধন করেন, তাহার অনুগমন করাই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া আমাদের পক্ষে এরূপ বশ্যতা স্বীকার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তারই জন্য

আমরা গুরুর চরিত্র অনুকরণ করিতে যাইয়া পদে পদে ভয়াবহ পর-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকি।

আমাদের সকলেরই এই দশা। হিন্দুয়ানী খৃষ্টিয়ানীর একটা অদ্ভুত মিশ্রণে আমাদের চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে এই দুইটা ভাবই পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই কারণে সময় সময়, আগেই বলিয়াছি, তাঁর আচার-আচরণে দুর্ব্বলতা ও অসামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠে।

অশ্বিনীকুমারের মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি নাই। কোন একটা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সেই জন্য এ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার চরিত্রে এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের একটা যথাযথ সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যের দৃষ্টি দিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত প্রাচ্যকে দেখেন নাই বা প্রচ্যের দৃষ্টি দিয়া পাশ্চাত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের বিশিষ্ট প্রভাব তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যা-মন্দিরে যুবকবৃন্দের শিক্ষাগুরু রূপে, প্রচারক রূপে, শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বত্বাধিকারের রক্ষীরূপে তাঁহার চরিত্রে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব দেখিতে পাই। অপরপক্ষে, বিশেষতঃ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে ভগবানের নাম সংকীর্ত্তনে, ভাগবত আবৃত্তিতে এবং ভক্তিযোগ বা কর্ম্মযোগের সাধনে—তাঁহার চরিত্রে প্রাচ্য ভাব বেশী ফুটিয়া উঠে।

জনমণ্ডলীর চিত্তে স্থায়ী আসন—বৈষ্ণব সাধনার প্রভাব

আর এই হিন্দুভাব লইয়া আজ অশ্বিনীকুমার অনন্যলভ্য লোকনায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র একজন লোক-শিক্ষক

এবং আধুনিক জননায়ক হইলে তাঁহার প্রতিপত্তি ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। সে হিসাবেও তাঁহার ভক্ত সংখ্যা কম নহে। আমার বোধ হয় যশোহর হইতে সুদূর শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গের নব্যশিক্ষিত যুবকসমাজে তাঁহার অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার বরিশালস্থ কলেজে তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্ট অংশটুকু অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার চরিত্রের এবং শিক্ষার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই। তথাচ, এ কথা কিছুতে অস্বীকার করা যায় না যে, অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর চিত্তের উপরে তিনি যে ভক্তির আসন লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে এতটা বড় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁর হিন্দুত্বেই অশ্বিনীকুমারের লোকনায়কত্বের মূল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণব প্রভাবই বলবত্তর। আধুনিক সাধনায় মানুষকে অতি বড় করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের মনুষ্যত্বের উপরেই আজিকার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত। নর-সেবাই দেব-সেবা। আর ইহার সঙ্গে আমাদের বৈষ্ণব সাধনার অতি সুন্দর মিল রহিয়াছে। নরের মধ্যে নারায়ণকে দেখাই বৈষ্ণব সাধনার মূল সাধ্য। 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতং'—ইহাই বৈষ্ণবতত্ত্বের মূল সূত্র। অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় এমন স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে মানবের ঈশ্বরত্বের কথা প্রচার করে নাই। মানবের দেহ এবং চিত্তবৃত্তিকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া, পিতা-পুত্র, নায়ক-নায়িকা, সখ্য প্রভৃতির সম্বন্ধকে ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া, বৈষ্ণবতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব সাধনার বিশেষত্ব। মানবের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি এবং তাহার

চিত্তবৃত্তির বিনাশ বা নিরোধ নহে, কিন্তু এ সকলকে একটা চরম আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র। এই ভাবঅশ্বিনীকুমারের সামাজিক আচার ব্যবহারে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ অশ্বিনীকুমার হিন্দু সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধ পরিপোষক, কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তিনি সকল সংস্কারের গণ্ডী কাটাইয়া উঠেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি কখনো বক্তৃতা দেন নাই, কিন্তু সামাজিক কর্ত্তব্য এবং মানবের কল্যাণের জন্য অনেক স্থলেই তিনি জাতিভেদ প্রথার গ্রন্থি শিথিল করিয়াছেন। বহু বৎসরের নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার জন্য এক অক্ষয় স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের কাছে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহচর বা কমিশনারের বিশ্বস্ত বন্ধু নহেন; তাহারা তাঁহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্দ্দিনের সহায়, এবং দুঃখে-কষ্টে একান্ত প্রিয়জন বলিয়াই জানে। অগাধ অর্থ দিয়া নহে, বাগ্মিতার মোহিনী শক্তিবলে নহে, জ্ঞানগরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায় ভাবে ও কার্য্যে সম্পূর্ণ কার্য্যে এক হওয়াই যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব। আমরা এদেশে অধুনা একমাত্র অশ্বিনীকুমারেই এই লোকনেতৃত্বের কতকটা আভাস পাই। তত্রাচ এ ভাব এ দেশে নূতন নহে, ইহা বহু পুরাতন। দেশ-কাল-পাত্রোচিতভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে—এই মাত্র।

বিপিনচন্দ্র পাল

কৈফিয়ৎ*

(১)

গত ২২শে কার্ত্তিক (১৩৩৩) সত্তরে পা দিয়াছি। এদেশে এ কালে সত্তর বছব বাঁচিয়া থাকা কম কথা নহে। কেবল বাঁচিয়া থাকারই একটা আনন্দ আছে। সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য শোক-তাপ কিছুতেই এই আনন্দকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে না। অতিশয় দুঃখতাপী যাহারা এই জন্য তাহারা পর্য্যন্ত অশেষ কষ্টের মধ্যেও জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া এই জীবন কাটিয়াছে; কিন্তু সেসকল জীবনের আনন্দকে নষ্ট করে নাই। এই দীর্ঘ আয়ুর জন্য ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা সহকারে অসংখ্য প্রণিপাত করি।

এ জগতে আসিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি ইহা সৌভাগ্যের কথা। আবার যদি এই সংসারে জন্মিতে হয়, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষেই জন্মিতে চাই, সুখ-সমৃদ্ধিশালী অন্য কোন দেশে জন্মিতে চাহি না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা। সর্ব্বোপরি এই বাংলা দেশে এযুগে জন্মিয়াছি, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। মৃত জাতি কি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়, এযুগে এই বাংলা দেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি। এ পরম সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।

সকলেই বলেন, ভারতবর্ষের এই নবযুগের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ

* বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবন-স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত।

রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনকে দেখি নাই, আমার জন্মের চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা বিদেশে বিভূমে দেহরক্ষা করেন। শৈশবে বাবার মুখে তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম। বাবা তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন কহিতেন। বাবা নিজে মোস্‌লেম সাধনার কথঞ্চিত আস্বাদ পাইয়াছিলেন, এই জন্য রামমোহনকে মৌলবী বলিয়াই জানিতেন। রামমোহনকে চক্ষে দেখি নাই কিন্তু তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই ভারতবর্ষে নবজীবনের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা জানি। বিগত শতবর্ষে সেই বীজই অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া আধুনিক ভারতবর্ষকে ছাইয়াছে। যাঁহারা এই বীজে জলসিঞ্চন করিয়াছিলেন, যাঁহাদের সেবায় এবং ত্যাগে এই বীজ আজ এমন সতেজ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কাহারও কাহারও সঙ্গে অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার অবসরও পাইয়াছি। আমার ক্ষুদ্র জীবনের স্মৃতির সঙ্গে ইঁহাদেরও অনেকের স্মৃতি জড়াইয়া আছে। এই জন্যই আমার সামান্য জীবন-স্মৃতির যা কিছু মূল্য ও মর্য্যাদা, নতুবা লোকসমাজে এ কাহিনী কহিবার কোন অজুহাত থাকিত না।

(২)

আরেকটা কথা, মানুষ যত ক্ষুদ্র হউক না কেন কখনই নিঃসঙ্গ রহে না। আমাদের প্রত্যেকের জীবন যে সমাজে জন্মিয়াছি সেই সমাজ-জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত হইয়া আছে; মানুষ একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী নিজের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল ভোগ করে, ইহা শাস্ত্রবাক্য হইলেও সত্য নহে। মানুষ বিশাল বিশ্বের অনাদিকৃত কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া এ সংসারে জন্মে। নিজের

কর্ম্মের দ্বারা ইহজীবনে বিশ্বের এই কর্ম্মের বোঝাকে লাঘব বা গুরু করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। একথা অস্বীকার করিবার জো নাই।

সদ্যজাত শিশুর ক্ষুদ্র জীবন তাহার পিতামাতার জীবন-ধারার মিলনে উৎপন্ন হয়। যখন আত্মস্থ হইয়া সূতিকাগারের দরজায় যাইয়া দাঁড়াই, তখন মনে হয় পবিত্র ত্রিবেণী তীর্থে উপস্থিত হইয়াছি, প্রত্যেক মানুষের জীবন এইরূপে এক একটি ত্রিবেণী সঙ্গমের সৃষ্টি করে। পিতার জীবনে ও মাতার জীবনে তাঁহাদের নিজ নিজ পিতামাতার দুইটি জীবন ধারা মিলিয়াছিল। সেই জীবন-স্রোত পিতামাতার জীবন ধারা বাহিয়া আমার ক্ষুদ্র জীবন সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে যদি নিজের এই অকিঞ্চিৎকর জীবন-স্রোতকে ধরিয়া বাহিয়া চলি, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র জীবনকে বিশ্বের অনন্ত জীবন-স্রোতের মধ্যে ক্ষণিক তরঙ্গভঙ্গরূপে দেখিতে পাই। বিশ্বের পূর্ব্ববর্ত্তী সকল জীবন মিলিয়া আমার এই জীবন সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের অনাদিকৃত কর্ম্মের বোঝা, আমি বুঝি বা না বুঝি আমার মাথার উপরে পড়িয়াছে।

একাকী আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু কেবল নিজকৃত কর্ম্মবোঝা মাথায় লইয়া নহে। আমার জন্মে পিতামাতা তাঁহাদের কর্ম্মবোঝা কেবল আমার মাথায় চাপাইয়া দেন নাই, তাঁহারাও পূর্ব্ব-পুরুষদের কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; মানুষের কর্ম্মের দায় এক পুরুষ বা দুই পুরুষের নহে। প্রথম মানব যেদিন এই পৃথিবীর আলোতে চক্ষু খুলিয়াছিল, সেদিন হইতে অন্ধকার শিশুর কর্ম্মের বোঝা জমিতে আরম্ভ

করিয়াছে। অথবা প্রথম মানবের কথাই বা বলি কেন? যেদিন হইতে এই সৃষ্টির সূত্রপাত, সেইদিন হইতেই সদ্যজাত শিশুর সংসারের জাল অদৃশ্য হস্তে বোনা আরম্ভ হইয়াছে। মাথার উপরে জ্যোতিষ্কমণ্ডল, পায়ের নীচে এই পৃথিবী—ইহাদের অভিব্যক্তির সঙ্গে তিলে তিলে অনাদিকাল অনন্ত গগন এই ক্ষুদ্র জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। এই সৃষ্টিতে জড় ও চেতন যাহা কিছু ছিল ও যাহা কিছু আছে, সকলের সঙ্গেই সদ্যজাত মানব শিশুর জীবন জড়াইয়া রহিয়াছে। আলো ও অন্ধকার, রৌদ্র এবং বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র, দাবানল ও ভূকম্পন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, পর্ব্বত ও সমুদ্রের সৃষ্টি, সাগরের তরঙ্গ ও নদীর স্রোত, বিশাল বনস্পতি সমাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্যানী, প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবজন্তুসকল, কীট, পতঙ্গ, পুষ্পলতা সকলে মিলিয়া সৃষ্টির আদি হইতে এই ক্ষুদ্র মানব শিশুর জীবনকে গড়িয়া পিটিয়া তুলিয়াছে। ঐ সকল কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া মানুষ এ সংসারে জন্মগ্রহণ করে। নিঃসঙ্গ একাকীত্বের কল্পনা এই সৃষ্টিতে সম্ভব নহে।

মানুষকে যতদিন আমরা এই ভূপৃষ্ঠে দেখিতেছি, জীব-বিজ্ঞান নৃতত্ত্ব এবং সমাজ-বিজ্ঞান যতদিনের খোঁজ পাইয়াছে, ততদিনই মানুষকে আমরা সামাজিক জীব বলিয়া জানিয়াছি। কোন কোন পশু যেমন দল বাঁধিয়া থাকে ও চলে, মানুষ যখন নিতান্ত পশুর মতই ছিল, তখনও তেমনি সমাজ বাঁধিয়া বাস করিত। সৃষ্টির আদি হইতেই মানুষ তার সমাজের কর্ম্মের বোঝাও বহন করিয়া আসিয়াছে। সমাজের ভালো-মন্দ তাহার নিজের জীবনের ভালোমন্দকে সর্ব্বদাই চালাইয়া লইয়াছে। মানুষ একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী

নিজের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলভোগ করে, আর একাকী নিজের কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া মৃত্যুতে ইহলোক হইতে সরিয়া পড়ে—ইহা মিথ্যা কথা; আমরা নিখিল বিশ্বের কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া জন্মগ্রহণ করি। এই বিশ্বের কর্ম্মের বোঝাকে ইহ-সংসারে নিজকৃত কর্ম্মের দ্বারা লঘু ও গুরু করিয়া মৃত্যুকালে যাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া যাই, তাহাদের মাথায় সেই বোঝা চাপাইয়া দেই। তাহারা পুরুষানুক্রমে আমাদের সুকৃতির ফলভোগ করে, আর আমাদের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। যতদিন না এই প্রায়শ্চিত্তের শেষ হয়, ততদিন কাহারও মুক্তি নাই। আমরা যে লোকেই থাকি না কেন, ততদিন আমাদের ইহ-জীবনে কৃত কর্ম্মবন্ধন আমাদের অনুসরণ করে। বিশ্বের মুক্তি ভিন্ন বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির মুক্তি নাই। ইহারই নাম কর্ম্মফল।

(৩)

এইভাবে নিজের ক্ষুদ্র জীবনের দিকে যখন তাকাই, তখন এ জীবনকে কিছুতে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ভাবিতে সাহস হয় না। এই বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির ইতিহাসটি লুকাইয়া আছে। জড়-বিজ্ঞান সেই গোপন লিপিরই উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিশ্বের প্রত্যেক জীবকোষাণুর মধ্যে সৃষ্টির সমগ্র প্রাণীজগতের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। জীব-বিজ্ঞান তাহারই আলোচনা করিয়া জীবের প্রকৃতি ও অভিব্যক্তির তথ্য বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে সেইরূপ সমগ্র মানব-সমাজের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মানুষ যত ছোট হউক না কেন, তাহার অকিঞ্চৎকর জীবনের সঙ্গে তাহার সমসাময়িক সমাজ-জীবনের

ধারা ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া রহে। এইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ভিতর দিয়া তাহার সমসাময়িক সমাজের জ্ঞান, ভাব ও কর্ম্মচেষ্টা ফুটিয়া উঠে। টানা ও পোড়েন মিলিয়া যেমন কাপড় বুনে, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ও তাহার সমাজের জীবন মিলিয়া বিশ্বমানবের আত্মপ্রকাশের তাঁতে পাড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন কালের ইতিহাস রচনা করে। সমাজকে ছাড়িয়া ব্যক্তি রহে না; ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমাজ চলে না। সমাজের সমষ্টিগত জীবন সমাজের স্থিতিরক্ষা করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের প্রেরণা সমসাময়িক সামাজিক অভিব্যক্তিতে গতিবেগ সঞ্চয় করে। এইভাবে মানুষের সভ্যতা ও সাধনা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজকে চিনিতে হইলে সেই সমাজের অন্তর্গত স্বতন্ত্র মানুষগুলিকে চিনিতে হয়, আবার এই ক্ষুদ্র মানুষগুলির জীবন ও কর্ম্মের মূল্য বুঝিতে গেলে তাহাদের সমসাময়িক সমাজের মধ্যে ফেলিয়া তাহার কালি কষিতে হয়। জীবনচরিত সমাজের নিগূঢ় শক্তি ও অভিব্যক্তির সূত্র ধরাইয়া দেয়। এইভাবে ব্যষ্টিরূপে ব্যক্তিকে ও সমষ্টিরূপে সমাজকে দেখিতে হয়। ব্যষ্টিকে ছাড়িয়া সমষ্টির বাস্তবতা থাকে না; সমষ্টিকে ছাড়িয়া ব্যষ্টির সার্থকতা বোঝা যায় না। ইহাই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের গোড়ার কথা।

(৪)

এই দিক দিয়া দেখিলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনস্মৃতির একটা সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমার এই জীবনস্মৃতি বা আত্মচরিত যদি কেবল আমার নিজের কথাই হইত, ইহাকে লোকসমাজে প্রচার করা সঙ্গত হইত না। কিন্তু আমার সত্তর

বৎসরের জীবনকথা বাস্তবিক এই বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসেরই কথা। আমার ক্ষুদ্র জীবন বাংলার এই সত্তর বৎসরের সমাজ জীবনের সঙ্গে কাপড়ের টানা ও পোড়ানের সূতার মতন জড়াইয়া আছে। এই সত্তর বৎসরে বাংলা দেশের চিন্তায়, ভাবে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এক যুগান্তর ঘটিয়াছে। আমার মতন দুই চারিজন লোক এখনও এই পরিবর্ত্তনের সাক্ষী রূপে বাঁচিয়া আছেন। ইঁহারা চলিয়া গেলে প্রাচীন পুঁথিপত্র ব্যতীত সাক্ষাৎভাবে এই সত্তর বৎসরের ইতিহাসের সাক্ষ্য দেবার কেহ থাকিবে না। আর কেবল পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া কোন ব্যক্তির বা সমাজের জীবনের সকল সঙ্কেত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা যা কিছু বলি বা লিখি বা করি তাহাতে আমাদের চিন্তার ভাবের বা কর্ম্মের সকলটা কিছু ব্যক্ত হয় না। অনেক সময় এই জন্য কথা বা কাজের বিচার করিয়া কোন ব্যক্তির বা সমাজের চরিত্রের বিচার সম্ভব হয় না। যাঁহারা স্রষ্টা, বক্তা বা কর্ত্তা তাঁহারাই যদি নিজেদের বাক্যের সৃষ্টির বা কর্ম্মের কথাটা খুলিয়া কহেন তবে তাহার সকল অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে। এই জন্যই কোন সমাজের ইতিহাসের সত্য মর্ম্ম বুঝিতে হইলে সেই সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনের কথা জানিতে হয়। ইহাই আত্মচরিতের সার্থকতা। এইভাবে যদি আত্মচরিত লিখিতে পারা যায় তাহা হইলে ইহা লেখকের আত্মভিমানের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে পারে না। এইভাবেই নিজের জীবনস্মৃতি লিখিতে বসিয়াছি।

(৫)

আরও একটা কথা আছে, সেটা ধর্ম্মের ও ভক্তি সাধনের কথা। যখন আত্মস্থ হইয়া নিজের জীবনের দিকে তাকাই তখন ত' এ জীবনের

উপরে কোন প্রকারে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানের বিন্দু-পরিমাণ অবসর খুঁজিয়া পাই না। এ জীবনে একটি শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা সকলের চাইতে বড়। সকল সময় মনে রাখিতে পারি বা না পারি, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না যে, এ জীবনের কর্ত্তা আমি নিজে নহি। নিজে যাহা করিতে চাহি নাই বা করিব ভাবি নাই, বহুবার তাহাই করিয়াছি ও তাহাই হইয়াছে। দীর্ঘ জীবনের প্রায় শেষ সীমানায় আসিয়া যখন পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, তখন সত্যই বলিতে পারি—

'হরি হে, তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও
আপনি বাজাও তালে,—

মানুষ তো সাক্ষীগোপাল, কেবল আমার আমার বলে। বারম্বার ইহা দেখিয়া কহিয়াছি—

'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি :
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

স্বাধীনতা ও নিয়তি (free will and determination), পাপপুণ্যের দায়িত্ব (moral responsibility) এ সকল তর্ক তুলিয়া জীবনের এই মুখ্য শিক্ষার সত্য ও মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারি নাই। জানি না, সত্যই আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না, বুঝি না পাপ-পুণ্যের কথা। স্বাধীনতা নাই এমনও বলি না, পাপ-পুণ্যের ভেদ ও দায়িত্ব নাই ইহা ভাবিতে সাহস হয় না; কিন্তু সকলের উপর এ কথা সত্য যে এ জীবনের কর্ত্তা আমি নহি। এই

কথাটা যখন ভুলিয়া যাই, তখনই যত দুঃখ, যত তাপ ভোগ করি।

এ জীবনের কর্ত্তা আমি নহি বলিয়াই এ জীবনের কথা নিঃসঙ্কোচে লিখিতে ও বলিতে পারি। ভক্তি-সাধনের একটা প্রধান অঙ্গ 'স্মরণ'। এ 'স্মরণ' কি কেবল ভগবৎ ও বিষ্ণুপুরাণে আবৃত্তি করিয়াই করিব? ভগবতের অর্থ ভাগবৎ করে না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের টীকা দিয়া ভাগবতাদি পুরাণের ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই তাহার সদ্ ব্যাখ্যা হয়।

এই জন্য নিজের জীবনের স্মৃতি ও ভক্তিসাধনের অঙ্গ হইতে পারে, হইবে কি না ঠাকুর জানেন। তাঁহারই নাম লইয়া তাঁহারই চরণে এই কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, ইহাতে প্রবৃত্ত হইলাম।

* * * *

শৈশবস্মৃতি

কোটের-হাট—বাখরগঞ্জ

ঢাকা হইতেই বাবা মুন্সেফ হইয়া প্রথমে যশোহরের কোন মহকুমায় যান। এখানে বেশীদিন ছিলেন না; সেজন্য মা তাঁহার সঙ্গে যশোহর যান নাই। যশোহর হইতে বদলী হইয়া বরিশালের অন্তর্গত কোটের-হাট মহকুমায় যান। এখানে বোধ হয় তিন চার বৎসর ছিলেন। কোটের-হাটে আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কোটের-হাটের কথা আমার খুব পরিষ্কার মনে আছে।

কোটের-হাটের মহকুমা অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছে। নলচিঠির নিকটে এখনও কোটের-হাট বাজার আছে। তিন চার বছর আগে ঝালকাঠি গিয়াছিলাম। সেখান হইতে নিকটবর্ত্তী দু-তিনটা গ্রামেও

যাইতে হয়। এসময়ে এক ভদ্রলোকের মুখে বাবার স্বাক্ষর-করা একটা দলিল তাঁদের বাড়ীতে আছে শুনিয়াছিলাম। এইরূপ দুই-একটা পুরাতন দলিলেই কোটের-হাটে যে একটা মুন্সেফি আদালত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনও সাব-ডিভিসনের সৃষ্টি হয় নাই। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতও একেবারে পৃথক্ হয় নাই। মুন্সেফরাই দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন। আজকালকার দিনে সাব্‌ডিভিসনাল অফিসারদের যে পদ ও মর্য্যাদা, ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাংলায় মুন্সেফদের সেই পদ ও মর্য্যাদা ছিল।

কোটের-হাটের নীচে একটা খাল ছিল। সেখানে প্রায়ই কুমিরের উপদ্রব হইত। তাহার চারিদিকে জঙ্গল ছিল। সে জঙ্গলে প্রায়ই বাঘ দেখা যাইত। এমন কি রাত্রিকালে বিছানায় শুইয়া মাঝে মাঝে বাঘের ডাক শুনিতে পাইতাম। আমাদের বাসার নিকটেই একটা পুকুর ছিল। জোয়ারের সময় সেই পুকুরের জল তীর ছাপাইয়া উঠিত। কখনও কখনও আমাদের উঠান পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিত। সেই জোয়ারের জল দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইত তাহা আজও ভুলি নাই। জোয়ারের জলের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে পুঁটি, মকা—কলিকাতার মৌরালা, বেলে প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ সফরে বাহির হইত। এ সকল দৃশ্য আমার অন্তরে নানা প্রকারের কৌতূহল জাগাইয়া দিত। আমি কবি নহি, কিন্তু সকল মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু কবি-কল্পনার বীজ লুকাইয়া থাকে। কোটের-হাটের জোয়ার ভাঁটার খেলা আমার মধ্যে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল। জলপ্লাবনে আজিও আমার চিত্তকে মাতাইয়া তোলে।

মুন্সেফি কাছারিঘর খালের ধারে একটা উঁচু জায়গায় ছিল। তাহার সামনে একটা মাঠ ছিল। সেই মাঠে মাঝে মাঝে গ্রামের লোকেরা আসিয়া হাট বসাইত। মাঝে মাঝে নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা বড় বড় বাঘ মারিয়া পুরস্কারের লোভে কাছারির সামনে আনিয়া ফেলিত। একবার পূজার সময় বাবা বাড়ী যাইবার মতন ছুটি পান নাই। আমাদের বাড়ীতে পূজা হইত। আমি বাড়ী যাইবার জন্য বায়না ধরিলাম। বাবা আমার কান্না থামাইবার জন্য কোটের-হাটের নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাঁহাদের বাড়ীতে পূজা হইত, তাঁহাদিগকে মহকুমায় আনিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিলেন। সেবার বিজয়ার দিনে কাছারির সামনের মাঠে একটি বড় মেলা হইয়াছিল। এখনও সে ছবি চক্ষে ভাষিতেছে।

(৩)

কোটের-হাটে বাবার সঙ্গে আমাদের অনেক আত্মীয় কুটুম্ব চাকুরীর লোভে গিয়াছিলেন। গ্রামের ভৃত্যশ্রেণীরও অনেকে গিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট হইতে বরিশাল অনেক দূরের পথ। বোধহয় নৌকায় দশ বারো দিন লাগিত। এ অবস্থায় শ্রীহট্টবাসী কোন রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে একাকী অথবা কেবলমাত্র নিজের পরিবারবর্গের লোককে লইয়া অত দূরদেশে যাইয়া বাস করা সম্ভব ছিল না। বাবার সঙ্গে সঙ্গে এই কারণে আমাদের নিজের লোকেরা কোটের-হাটে গিয়াছিলেন। ইঁহারা সেখানে সকলেই যথাযোগ্য কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। জ্ঞাতি-কুটুম্বেরা মুন্সেফি আদালতের আমলা হইয়াছিলেন। ভৃত্যশ্রেণীর যাঁরা গিয়াছিল তারা পেয়াদা হইয়াছিল। কোটের-হাটে এইরূপে আমাদের নিজেদের একটা উপনিবেশের মত জমিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু বাবার অধীনে যাঁহারা চাকুরী করিতেন, তাঁহাদের কেহই আমাদের বাসায় থাকিতে পাইতেন না, স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিতে হইত। এমন কি ইঁহাদের সঙ্গে আমাদের যে কোন সম্পর্ক আছে, ইহাও প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সম্পর্কে বাবা কাহারও দাদা, কাহারও কাকা, কাহারও মামা ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা বাবাকে সকলেই কেবল মুন্সেফ মহাশয় বলিয়া ডাকিতেন, সম্পর্ক অনুযায়ী সম্বোধন করা নিষিদ্ধ ছিল। একবার আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই বাবাকে দশজনের সমক্ষে কাকা বলিয়াছিলেন। এই অপরাধে তখনই তাঁহার কর্ম্ম যায়। যতদিন বাবা কোটের-হাটে ছিলেন, ততদিন তিনি সেখানে আর চাকুরী পান নাই।

(৪)

তাঁহার বিচারে লোকে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ না করিতে পারে, বাবা সে বিষয়ে অতি সাবধান ছিলেন। একদিনের কথা মনে পড়ে। আমার বয়স তখন বছর চারেক হইবে। বাবা দু'বেলা আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পাতে বসাইয়া খাওয়াইতেন। একদিন প্রাতে আমরা খাইতে বসিয়াছি, মা কলমি শাক পরিবেশন করিলেন। বোধহয় ইতিপূর্ব্বে বাবা কোটের-হাটে কলমি শাক খান নাই। এ শাক কোথা হইতে পাইলেন, মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, এক পাটুনী বুড়ী দিয়া গিয়াছে। 'দাম নিয়াছে ?'— বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন। 'কলমি শাকের আবার দাম কি ? সেও দাম চায় নাই, আমিও দিই নাই'—মা, একথা কহিলেন। বাবা অমনি ভাতের থালা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন। বাহিরে যাইয়া পেয়াদা পাঠাইয়া সেই পাটুনী বুড়ীকে ডাকাইয়া তাঁহার শাকের দাম

দিয়া, আর সে যেন কখনও আমাদের বাসার নিকটে না আসে— আসিলে বিশেষ শাস্তি পাইবে এইরূপ সাবধান করিয়া দিলেন। সেদিন বাবার আর আহার হইল না। মাকেও উপবাস থাকিতে হইল। মা বুঝিলেন, হাকিমের স্ত্রী হইয়া কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকারের দান বা ভেট গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে।

এই সামান্য কলমি শাকের জন্য বাবা এতটা বিচলিত হইয়াছিলেন কেন? ইহার বিশেষ কারণ ছিল? মাও পরে সে কথা শুনিয়াছিলেন। মা'র মুখে আমি শুনিয়াছি, এই পাটুনী বুড়ীর এক অতি অকর্ম্মণ্য পুত্র ছিল। সে মাঝে মাঝে চুরির অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হইত। এই জন্য তাহার মা যে হাকিমের বাড়ী যাতায়াত করে বাবা কিছুতেই ইহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। যে কারণে ঢাকায় পেশকারি করিবার সময় তিনি কালীনারায়ণ রায়ের লোকদের প্রদত্ত দুই হাজার টাকা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এই কলমি শাক সম্বন্ধেও সেই কারণেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

(৫)

সন্তানপালন সম্বন্ধে বাবা চাণক্যনীতির অনুসরণ করিতেন।

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তে তু ষোড়শেবর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ।"

পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাবা আমাকে দেবতার মতন পূজা করিয়াছিলেন। আমি যখন যাহা চাইতাম, তখনই তাহা পাইতাম, কোনদিন আমার গায়ে বাবা হাত তুলেন নাই, অন্য কাহাকেও তুলিতে দেন নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁহার বৈঠকখানায় আমাকে একটা 'পলো' চাপা দিয়া রাখিয়া কাছে বসিয়া নিজের কাজ

করিতেন। নিজের হাতে আমাকে স্নান করাইয়া দিতেন, নিজের হাতে বসাইয়া খাওয়াইতেন। তাঁহাকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে দেখিয়া আমিও সন্ধ্যা-আহ্নিক করিব বলিয়া বায়না ধরিলাম। তখন আমার জন্য ছোট কোষাকুষি, ত্রিপদী রেকাবী, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম বাজার হইতে আসিল। আমিও বাবার কাছে বসিয়া কোষাকুষি লইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া 'পূজা' করিতে লাগিলাম।

(৬)

কোটের-হাটের আর একটি স্মৃতি পঁয়ষট্টি বছরেও মুছিয়া যাওয়া ত দূরের কথা, এতটুকুও ম্লান হয় নাই। আমাদের বাসার পিছনে একটা হোগলার বন ছিল। সে বনে বহু গোসাপ বাস করিত; এরা সর্ব্বদা নিঃসঙ্কোচে পোষা কুকুর-বিড়ালের মতন সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। কি কারণে জানি না, গোসাপ মারা নিষিদ্ধ ছিল। একদিন আমার ছোট ভগিনী, তখনও ভাল করিয়া তাহার কথা ফোটে নাই, আমাদের শুইবার ঘরের মেঝেতে ঘুমাইতেছিল। মা তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া পাকশালে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, দুইটা বড় গোসাপ ঘুমন্ত শিশুর বিছানায় তাহার দুই পাশ-বালিশের দুইধারে চোখ বুঝিয়া পড়িয়া আছে। আমিও মার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিয়া এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। সাপ দুইটা আমার ভগিনী অপেক্ষা অন্ততঃ দেড়গুণ লম্বা ছিল। কুমিরের মতন তাহাদের মুখ। মা তো এই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রার্পিতের মতন দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন শব্দ করিলেন না— চীৎকার করাতো দূরের কথা, তিনি যে ঘরে ঢুকিয়াছেন বোধ হয় সে সাড়া গোসাপ দুইটা পাইয়াছিল। তাহারা চোখ খুলিয়া মাকে

দেখিয়া আস্তে আস্তে পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন মা কাঁপিতে কাঁপিতে সন্তানকে বুকে আঁকড়াইয়া সে স্থান হইতে ছুটিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। এই দৃশ্য যখনই মনে পড়িয়াছে, তখনই মার স্নায়ুমণ্ডল যে কত স্থির এবং শক্ত ছিল, ইহা ভাবিয়া অবাক্ হইয়াছি।

(৭)

কোটের-হাটে আমাদের নিজের লোক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পৃথক্ বাসায় থাকিতেন, এ কথা আগেই বলিয়াছি; সুতরাং আমাদের নিজেদের পরিবার অতি ছোট ছিল। আমার পিতা পিতামহের একমাত্র সন্তান ছিলেন। আমার পিতামহের একমাত্র সোদর ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহারও কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সুতরাং তিন পুরুষের মধ্যে আমাদের পরিবার কোন দিনই বড় ছিল না। কোটের-হাটে মায়ের সঙ্গে একটি মাত্র স্ত্রীলোক দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। সেকালে আমাদের অঞ্চলে সম্পন্ন কায়স্থ বৈদ্য পরিবারে সর্ব্বদাই দুইচার জন দাসদাসী পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতেন।

তখনও ক্রীতদাস প্রথা উঠিয়া যায় নাই। সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা সামান্য মূল্য দিয়া দাসদাসী জন্মের মতন কিনিয়া রাখিতেন। এ সকল দাসদাসীর কেবল ভরণপোষণের ভার নহে, ইহাদের বিবাহাদির ভারও গৃহস্বামী বহন করিতেন। আপনার পুত্রকন্যাগণের যেরূপ বিবাহ দিতেন ততটা সমারোহের সহিত না হইলেও এসকল দাসদাসীরও পুত্রকন্যাগণের যথারীতি বিবাহ দিতেন, এবং ইহা নিজেরই দায় বলিয়া মনে করিতেন। রক্তের সম্বন্ধ না থাকলেও এসকল দাসদাসী তাহাদের প্রভুপরিবারের সঙ্গে সর্ব্বদাই অতিশয় কোমল স্নেহের

সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিত। এই মহিলাটি—ইঁহাকে দাসী বলিতে আমার মনে আঘাত লাগে—আমার মাতামহের পরিবারভুক্ত ছিলেন। মায়ের বিবাহ হইলে ইঁনি তাঁহার সঙ্গে আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাদের পরিবারভুক্ত একজন হইয়া যান। মা বড় হইয়া উঠিলে ইঁনি আমাদের বাড়ীতেই থাকিয়া যান। বাবার সঙ্গে মা সর্ব্বদাই বিদেশে থাকিতেন। এইজন্য ইঁনি মাকে ছাড়িয়া আমার মাতুলালয়ে যাইতে পারেন নাই। মা ইঁহাকে দিদি বলিয়া ডাকিতেন। কাঞ্চনী নামে ইঁহার এক কন্যা ছিল। আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই। বোধহয় আমার জন্মের পূর্ব্বে সে মারা যায়। বাবা ও আমার আত্মীয়স্বজনেরা ইঁহাকে 'কাঞ্চনীর মা' বলিয়া ডাকিতেন। আমার শৈশবে এবং বাল্যে ইঁনিই কার্য্যতঃ আমাদের পরিবারভুক্ত গৃহিনী ছিলেন। আমি একটু বড় হইয়া দেখিয়াছি যে, মা সাক্ষাৎভাবে লোকজনের সমক্ষে বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন না। বাবা ও মার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা কহিতেন না। প্রাচীনকালে আমাদের সমাজে ভদ্রপরিবারে গুরুজনের সমক্ষে স্বামী-স্ত্রীতে যখন তখন কথাবার্ত্তা বলা শিষ্টাচারসম্মত ছিল না। পারিবারিক বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে পরিবারে সর্ব্বাপেক্ষা বয়স্কা যিনি, পুরুষেরা তাঁহারই সঙ্গে পরামর্শাদি করিতেন, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে নহে। আমার জন্মের পরে আমাদের পরিবারে এই 'কাঞ্চনীর মা'ই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা বলিয়া সকল বিষয়ে বাবা ইঁহার সঙ্গে পরামর্শাদি করিতেন। মাকে কোন কথা কহিতে বা তাঁর কাছে কিছু জানিতে হইলে বাড়ীর ভিতরে যাইয়া কাঞ্চনীর মা বলিয়াই ডাকিতেন। মাও বাবাকে কোন কথা জানাইতে হইলে ইঁহার মুখেই জানাইতেন। ইঁনি যে আমাদের

নিজের লোক নহেন, ইঁহার সঙ্গে যে আমাদের রক্তের সম্পর্ক নাই, শৈশবে বহুদিন পর্য্যন্ত আমার এ জ্ঞান জন্মে নাই।

ইঁহাকে আমি মাসী বলিয়া ডাকিতাম। ইঁনি যে সত্যই আমার মাসী নহেন, ইহা কিছুতেই মনে করিতে পারিতাম না। মাকে যতটা ভালবাসিতাম, বোধহয় ইঁহাকে তার চাইতে বেশী ভালবাসিতাম। ফলতঃ আমি ইঁহারই কোলে মানুষ হইয়াছিলাম, বড় হইয়া মার মুখে একথা শুনিয়াছি। অতি শৈশবে আমি মাকে যতটা না আমার মূত্রপুরীষের দ্বারা পীড়িত করিয়াছি তদপেক্ষা শতগুণ অধিক পীড়া ইঁহাকে দিয়াছিলাম, মা নিজে বহুবার ইহার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। আপনার সন্তানকে মা যতটা না আত্মবিস্মৃত হইয়া পালন করেন, 'কাঞ্চনীর মা' আমাকে তদপেক্ষা বেশী আত্ম-বিস্মৃতি সহকারে লালন-পালন করিয়াছিলেন। অতএব ইহা কিছুই বিচিত্র নহে যে আত্ম-পর-জ্ঞানশূন্য শৈশবে আমি ইহার প্রতি মার চাইতেও বেশী অনুরক্ত ছিলাম। কোটের-হাটে থাকিবার সময় এইজন্য আমাদের আত্মীয় কুটুম্বেরা যখন-তখন আমাকে ক্ষেপাইতেন। 'কাঞ্চনীর মা' মরিয়া গিয়াছে এই কথা কিছুতেই আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। ইহা যে বলিত তাহাকে তাড়া করিয়া মারিতে যাইতাম। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হইয়াছে। বাংলার সুদূর পল্লীতে পর্য্যন্ত এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে ও এই আন্দোলনের ঢেউ গিয়া লাগিয়াছে। কোটের-হাঁটে আমার দুই খুল্লতাত ছিলেন, একজন বাবার মাসতুত ভাই, আর একজন তাঁহার মামাত ভাই। 'কাঞ্চনীর মা' বাবার শ্যালী স্থানীয়া ছিলেন বলিয়া ইঁহারা তাঁহাকে ঠাট্টা-পরিহাস করিতেন। ইঁহারা 'কাঞ্চনীর মা

মরিয়া গিয়াছে' না বলিয়া 'বিদ্যাসাগর মতে কাঞ্চনীর মার আবার বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে'—এই কাহিনী সৃষ্টি করিয়া আমাকে দেখিলেই বিবাহের ফর্দ্দ করিতে বসিতেন এবং সেইরূপে আমাকে ক্ষেপাইতেন। কোটের-হাটের স্মৃতির সঙ্গে এই সকলই জড়াইয়া আছে। আমার বার-তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত 'কাঞ্চনীর মা' আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। মা ইঁহাকে বড় ভগ্নীর মত ভক্তি করিতেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাবা ইঁহাকে আপনার শ্বাশুড়ীর মত সমীহ করিয়া চলিতেন, বাবা-মা'র কথা-বার্ত্তায় বা আচার-আচরণে ইঁনি যে দাসী এভাব কোনদিন প্রকাশ পায় নাই। আমার বয়স যখন তের কি চৌদ্দ সে সময়ে আমার বড় মামা বিবাহ করেন। ইহার অনেক পূর্ব্বেই আমার মাতামহী স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, মাতুল পরিবারে কোন গৃহিণী ছিলেন না। আমার মায়ের একজন খুল্লতাত-পত্নী একমাত্র গৃহিণী ছিলেন। ইঁহারা কিন্তু আমার মাতুলদের সঙ্গে একান্নভুক্ত ছিলেন না। আমার মাতুল দুই জন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহারা বিদেশে থাকিতেন। আমার বড় মামা বিবাহ করিয়া নববধূকে ঘরে আনিলে, 'কাঞ্চনীর মা' আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়া আমার মাতুল পরিবারের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে বোধহয় প্রায় উনিশ-কুড়ি বছর আমাদেরই পরিবারভুক্ত হইয়া ছিলেন। ইঁনি যে দাসী ছিলেন, আজও একথা ভাবিতে সঙ্কোচ হয়।

(৮)

কোটের-হাটের আর একটা কথা মনে আছে। সে হাসির কথা। মহকুমার বাজারে একটা কালীবাড়ী ছিল। বাজারের লোকেরা বোধহয় বারোয়ারী উপলক্ষে কালীবাড়ীতে একবার খেমটা-নাচ

দিয়াছিল। বাবা এসকল নাচ-গান প্রায় দেখিতেন না। অথচ নিমন্ত্রণ-রক্ষা না করিলে লোকের অমর্য্যাদা করা হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে আমাকে নাচ দেখিয়া কালীপ্রণামী দিয়া আসিবার জন্য পাঠাইতে চাহিলেন। খেম্‌টা-নাচ আমি কখনও দেখি নাই, খেম্‌টা-নাচ কাহাকে বলে তখন পর্য্যন্ত শুনি নাই। আমাদের অঞ্চলে প্রান্তিক ভাষায় চিম্‌টি কাটাকে খেম্‌টা কহে। খেম্‌টা নাচের এই অর্থ করিয়া, সেখানে যাইলে আমার গায়ে চিমটি কাটিবে এই ভয় পাইয়া কিছুতেই সে নাচ দেখিতে যাইতে রাজী হই নাই। বাবা শেষে আমাকে পাঠাইতে না পারিয়া বোধহয় আমার কোন জ্যাঠতুত ভাইকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়া সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

(৯)

কোটের-হাটের আরও একটা কথা ভুলি নাই। একবার সেখানে ওলাউঠা দেখা দেয়। সে সময় আমাদের বাড়ীর দাগুসিং কোটের-হাটে ছিলেন। ইঁহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহাকে আমি দাদা বলিয়া জানিতাম ও ডাকিতাম। ইঁহার ওলাউঠা হয়। জীবনসংশয়-উপস্থিত হইলে বাহির বাটিতে যে ঘরে রোগী ছিলেন, মা ও আমি ইঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য সে ঘরে গিয়াছিলাম। ঘরে বহু লোক, আমার বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্বেরা তাঁহার রোগশয্যায় বসিয়া নিজের হাতে হিমাঙ্গে আবীর ঘসিতেছিলেন। অন্তঃপুরচারিণী হইলেও মা অসঙ্কোচে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আর ওলাউঠা ভীষণ সংক্রমক রোগ জানিয়াও তাঁহার একমাত্র পুত্র আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই মুমূর্ষু রোগীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। একথা মনে হইলে আমি সর্ব্বদাই ভাবি আমার বাবা এবং আত্মীয়-স্বজনেরা যে ভাবে এই

ভৃত্যের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন আমি কি তা পারি? আমার মা আমাকে লইয়া এই সাংঘাতিক সংক্রামক রোগীর ঘরে যেমন নিঃসঙ্কোচে গিয়াছিলেন, আমার পুত্র বা পৌত্রকে লইয়া আমার পত্নী বা বধূ কি তাহা পারেন? আমাদের নানাদিকে বহু জ্ঞানলাভ হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আমরা যাহা জানি আমাদের প্রাচীনেরা তাহা জানিতেন না। কিন্তু এই জানার ফলে আমাদের মনে রোগের বা মৃত্যুর যতটা ভয় জন্মিয়াছে, ততটা ভয় তাঁহাদের ছিল না।

* * * *

বিদ্যারম্ভ

কোটের-হাটে বাবা কয়বৎসর ছিলেন মনে নাই। কোটের-হাটেই আমার বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ি হয়, এই কথাটা মনে আছে। তাহার পরেও বোধহয় বছর দুই বাবা কোটের-হাটে ছিলেন। মনে হয় আমার তিন বৎসর বয়স হইতে সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমরা কোটের-হাটে ছিলাম। গ্রাম হইতে আমাদের পুরোহিত আসিয়া আমার হাতেখড়ি করাইয়াছিলেন। ঘট স্থাপন করিয়া সরস্বতী পূজা হইয়াছিল। পূজা শেষে স্নান করিয়া নূতন কাপড় পরিয়া আমি সরস্বতীর চরণে যথাবিধি অঞ্জলি দিয়াছিলাম এবং—

"ত্বং ত্বং সরস্বতী নির্ম্মলবরণং।
রত্ন-ভূষিত-কুণ্ডলকরণাং॥"

ইত্যাকার স্তোত্র পড়িয়া পুরোহিতের হাত ধরিয়া পরিষ্কার মাটির উপরে একটা কাঠি বা শরের কলম দিয়া 'আঞ্জি ক, খ' লিখিয়াছিলাম। এই 'আঞ্জি' জিনিষটা যে কি তা জানি না। ইংরেজী বর্ণমালার S অক্ষরটা

উল্টাইয়া লিখিলে এই আঞ্জির মতন হয়। সংস্কৃত বা বাংলা বর্ণমালায় এনামে কোন বর্ণ নাই। বড় হইয়া এরূপ অনুমান করিয়াছি যে, বোধ হয় এই আঞ্জি প্রণবের কোন নামান্তর বা রূপান্তর হইবে। ব্রাহ্মণ বালকেরা উপনয়নের সময় ওঁ উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। শূদ্রদের এ অধিকার ছিল না। মনু কহেন যে, সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই ওঁ উচ্চারণ করিবে, না হইলে সে কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ নই বলিয়া আমাদের ওঁ উচ্চারণের অধিকার ছিল না। ওঁ লেখার অধিকারও ছিল না। অথচ হাতেখড়ির সময় ক, খ লিখিবার পূর্ব্বে মাঙ্গলিকরূপে ভগবানের নাম লেখা আবশ্যক। এইজন্যই বোধহয় সেকালে এই 'আঞ্জি' লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ অনুমান সত্য কি না জানি না। বাংলার অন্য কোন জেলায় ৬০/৬৫ বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতির হাতে-খড়ির সময়ে এরূপ 'আঞ্জি' লিখিয়া ক, খ লিখিতে হইত কি না বলিতে পারি না। আর হইলে, তাঁহারাই বা ইহার কি অর্থ করিতেন এ সন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়।

[২]

হাতে-খড়ি হইবার পূর্ব্বে আমি লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে আমার শৈশব-শিক্ষা বিদ্যারম্ভ হইতেই আরম্ভ হয়, ইহা সত্য নহে। আমার কথা ফুটিতে আরম্ভ হইলেই, বাবা আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া—আমাকে কাছে বসাইয়া বা কোলে লইয়া সংস্কৃত শ্লোক মুখে মুখে আবৃত্তি করাইতেন। যতদূর মনে আছে, বাল্মীকি রামায়ণের আদি শ্লোক—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধিঃ কামমোহিতম্॥'

এইটাই সকলের আগে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। তারপরে—

'রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম কমলাপতি'

কৃত্তিবাসের রামায়ণের এই শ্লোকটি শিখিয়াছিলাম। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি শ্লোক বাবা মুখে মুখে শিখাইয়াছিলেন। বিস্তর চাণক্য-শ্লোক তাঁর নিজের কণ্ঠস্থ ছিল। সেগুলিও তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন। একটু বড় হইলে পরে কতকগুলি শ্লোক আমার মুখস্থ হইয়া গেলে সন্ধ্যার পরে পিতাপুত্রে বসিয়া শ্লোকের প্রতিযোগিতা হইত।

খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষাদান যে আমাদের প্রাচীনেরা একেবারে জানিতেন না তাহা নহে। এই শ্লোক আবৃত্তি করাও একটা খেলার মতনই ছিল। এ ছাড়া খেলার ভিতর দিয়াই আমাদের শৈশবে আমরা ধর্ম্মশিক্ষাও লাভ করিতাম। হিন্দুর ধর্ম্ম মতের ধর্ম্ম নহে, আচারের ধর্ম্ম, ক্রিয়ানুষ্ঠানের ধর্ম্ম। কহিয়াছি, কোটের-হাটে অতি শৈশবে আমি বাবা সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন দেখিয়া কোষা-কুষি লইয়া তাঁহারই মতন সন্ধ্যাহ্নিকের অভিনয় করিতাম। খৃষ্টিয়ান পরিবারের শিশুরা যে ভাবে প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ এবং রাত্রে শুইতে যাইবার সময়, মায়ের কোলে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে, আমাদের সমাজেও ইহার অনুরূপ রীতি প্রচলিত ছিল। প্রত্যূষে জাগিয়াই আমাকে দুর্গানাম স্মরণ করিতে হইত—

'প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥'

ইহার সঙ্গে সঙ্গে—

'অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী স্তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরোন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥'

এই শ্লোকও আবৃত্তি করিয়া শয্যাত্যাগ করিতে হইত। আবার রাত্রে শুইতে যাইবার সময়ঃ—

'...... ....বিপত্তৌ মধুসূদনঃ।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে চ জনার্দ্দনঃ॥'

এই শ্লোক আবৃত্তি করিতাম। বাবার কাছেই এসকল শ্লোক শিখিয়াছিলাম।

(৩)

হাতে-খড়ি হইবার পরে আমি 'শিশুবোধ' পড়িতে আরম্ভ করি। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' বোধ হয় তাহার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও দেশের সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই। 'শিশুবোধেই' আমার প্রথম বর্ণপরিচয় হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত না হইলেও আমার মনে হয়, শিশু শিক্ষার জন্য শিশুবোধ অন্যান্য দিকে অতিশয় উপযোগী ছিল। চাণক্য-শ্লোক এই শিশুবোধেই প্রথম পড়িয়াছিলাম। বাবার মুখে বর্ণপরিচয়ের পূর্ব্বে যে সকল শ্লোক শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই এখন এই পুস্তকে ছাপার অক্ষরে পড়িতে পাইয়া পাঠে একটা নূতন আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে'—এসকল কথা এই শিশুবোধেই পড়িয়াছিলাম। কিন্তু শিশুবোধে সকলের চাইতে মিষ্টি

ছিল দাতাকর্ণের উপাখ্যান। এই উপাখ্যানটি বার বার পড়িয়া মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

এইরূপে বরিশালে থাকিতেই বাংলা লেখাপড়া কতকটা শিখিয়াছিলাম। শিক্ষক ছিলেন আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব। মনে পড়ে যে প্রতিদিন অপরাহ্নে মা আমাকে কাপড় চোপড় পরাইয়া কাছারীতে বাবার কাছে পাঠাইয়া দিতেন। আমি সেখানে যাইয়া তাঁহার এজলাসে উঠিয়া তাঁহার কাছে একটা চৌকিতে বসিয়া নীরবে বাংলা গভর্ণমেণ্ট গেজেট খুলিয়া পড়িতে চেষ্টা করিতাম বা পড়িবার ভান করিতাম। এইরূপে আমার শৈশবশিক্ষা আরম্ভ হয়।

পিতার প্রকৃতি ও আমার চূড়াকরণ

কোর্টেরহাটে মুন্সেফি করিবার সময় বাবা বোধহয় দুইবার পূজার সময় বাড়ী আসিয়াছিলেন। একবারের একটা ঘটনা মনে আছে। পূজার দিন দুই পূর্ব্বে বোধহয় বাবা বাড়ী পৌঁছেন। বাড়ী পৌঁছিয়াই শুনিলেন যে গ্রামের লোকেরা অন্যায় করিয়া এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে একঘরে করিয়াছেন। বাবা পরদিন প্রত্যূষে এই পরিবারের কর্ত্তাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাদিগকে সেইদিন হইতে আপনার পরিবারের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিলেন। ইঁহারা সেবারে আমাদের বাড়ীর দুর্গাপূজার পুরোহিতের কাজ করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকেরা এইজন্য বাবাকেও একঘরে করেন। ১৬ বৎসর কাল আমরা গ্রামে একঘরে হইয়া ছিলাম। তবে আমাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে দুই ঘর, এবং পল্লীর প্রতিবেশী শূদ্রদের দুই এক ঘর আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই দীর্ঘকাল ইঁহারা ছাড়া গ্রামের অপর

কেহ আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন না এবং আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। বাবা ইচ্ছা করিলেই যখন তখন এই গোলমাল মিটাইয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু নিজের দায়ে কাহারও নিকট মাথা হেঁট করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইহা দেখা গিয়াছে।

[২]

আমার বয়স যখন সাত কি আট বৎসর তখন কোটের-হাটের মহকুমা উঠিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাবাও রাজসেবা হইতে অব্যাহতি পান। অবসর পাইয়া তিনি বাড়ী আসিয়া আমার চূড়াকরণের ব্যবস্থা করেন। আজকাল বোধহয় হিন্দু সমাজেও এই সংস্কারটা উঠিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে, অথবা ইহার বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়াছে। চূড়াকরণ অর্থ সোজা বাংলায় কান ফোঁড়া। যাহাদের উপনয়ন সংস্কার ছিল না ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে চূড়াকরণ তাহাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সংস্কার ছিল। সম্পন্ন ভদ্রলোকেরা খুব জাঁক-জমক করিয়া পুত্রদের চূড়াকরণ করিতেন। * * *

[৬]

এই চূড়াকরণ ব্যাপারটা যে কি, কিসে ইহার উৎপত্তি আর কি বা ইহার সার্থকতা তখন বুঝিবার বয়সই হয় নাই, এখনও বুঝিয়াছি এমন বলিতে পারি না। আমাদের সমাজের লোকেরা একরূপ ধর্ম্মবুদ্ধিতে ইহার অনুষ্ঠান করিতেন; ইহার সার্থকতা বুঝিতেন কিনা সন্দেহ। জীবনের অধিকাংশ ব্যাপার যেমন বিনা বিচারে কেবল প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া কলের পুতুলের মত করিয়া যাইতেন, এই চূড়াকরণের অনুষ্ঠানও সেইরূপ হইত।

আজকাল বোধহয় আগেকার মতন এ অনুষ্ঠান হয় না। বিবাহের অনুষ্ঠানের আনুষাঙ্গিকরূপে কানে একটা শলাকা ছোঁয়াইয়াই এখন এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি ও ইতিহাস সমন্ধে কেহ কোন খোঁজখবর লন না।

আমার মনে হয় এই অনুষ্ঠানটি অতিশয় প্রাচীন। সমাজগঠনের অতি শৈশবাবস্থায় প্রত্যেক ব্যাক্তিকে নিজের কোন একটা অঙ্গ, ক্ষত করিয়া সে যে বিশেষ কোনও সমাজের অন্তর্ভুক্ত ইহা জানাইতে হইত। ধর্ম্মের একতা, আচারবিচারের একতা—এ সকলের দ্বারা সামাজিক ঐক্য বহুপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্ম যখন বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই, সামাজিক রীতিনীতি যখন প্রাচীন শ্রুতি ও স্মৃতির উপরে গড়িয়া উঠে নাই, তখন এক একটা বাহিরের চিহ্নের দ্বারা কে কোন্ গোষ্ঠির লোক ইহার পরিচয় হইত। বোধহয় সেই সময়ে আমাদের প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে এই কর্ণবেধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সমাজ-বিজ্ঞানীর চক্ষে হিন্দুর কর্ণবেধ ও মুসলমানদিগের ত্বকচ্ছেদ একই বস্তু। এশিয়ার ও আফ্রিকার প্রায় সকল আদিম জাতির মধ্যেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে একদিন আমরা হয় ইহাদের সগোত্র ছিলাম অথবা ভারতবর্ষে আর্য্যেরা আসিয়া ইহাদের এদেশীয় সগোত্রদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ এই কর্ণবেধ বৈদিক সংস্কারের অন্তর্গত নহে। সে যাহা হউক, আমার শৈশবে আমাদের অঞ্চলে চূড়াকরণ বৈদিক সংস্কারেরই মর্য্যাদা লাভ করিত।

আমার চূড়াকরণের সঙ্গে সঙ্গেই শৈশবের খেলাধুলা শেষ হইয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই বাবা প্রথমে কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী

ভাবে শ্রীহট্টের অন্তর্গত ফেঁচুগঞ্জ নামক মহকুমায় মুন্সেফ হইয়া যান। তারপর চিরদিনের মত হাকিমি ছাড়িয়া শ্রীহট্ট সদরে যাইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফেঁচুগঞ্জ হইতে শ্রীহট্ট যাইয়া বাল্যজীবন আরম্ভ করি। * * *

ফেঁচুগঞ্জ-শ্রীহট্ট

(৩)

* * *

ফেঁচুগঞ্জে আমাদের আপনা লোক বেশী কেহ যান নাই। আমার সমবয়স্ক কেহই ছিল না। আমি তখনও কোন পাঠশালায় যাই নাই। ফেঁচুগঞ্জে তেমন পাঠশালা ছিল কি না জানি না। বাবার কাছেই বাংলা লেখাপড়া করিতাম, এটুকু মনে আছে। হস্তলিপির উপর সেকালের লোকের খুব দৃষ্টি ছিল। বাবা প্রতিদিন আদালতে যাইবার সময়ে আমাকে বাংলা লেখা মকৃশ করিবার জন্য কাগজের মাথায় একটা লাইন লিখিয়া দিয়া যাইতেন। সেকালের পড়ুয়ারা প্রথম প্রথম কলাপাতায় মকৃশ করিত। কতকটা লেখা অভ্যাস হইবার পরে তালপাতায় লিখিবার অনুমতি পাইত। তারপর, হাতের লেখা পাকিয়া উঠিলে, কাগজে লিখিত। এখনকার মত কাগজ এত সস্তা ছিল না, এবং পয়সাও এত সচ্ছল ছিল না। সুতরাং অযত্নলব্ধ কলাপাতাতেই পড়ুয়ারা নিজেদের হাতের লেখা মকৃশ করিয়া পাকাইত। আমার বাল্যকালেও গ্রাম্যজীবনে এই পদ্ধতিই ছিল। তবে আমি নিজে আমার গ্রামের পাঠশালায় কখনও পড়ি নাই

বলিলেই হয়। এই জন্য শৈশব হইতেই কলাপাতা ও তালপাতার পরিবর্ত্তে কাগজেই লেখা অভ্যাস করিয়াছিলাম।

(৪)

বলিয়াছি যে, শিক্ষানীতিতে বাবা চাণক্যের নীতি অনুসরণ করিতেন।

'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রমাদাচরেৎ॥'

আমার শৈশবে ও বাল্যে বাবা প্রায়ই এই শ্লোকটি আওড়াইতেন। কার্য্যেও এই উপদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোটেরহাটে ছিলাম। সেখানে বাবার নিকট হইতে আদরই পাইয়াছিলাম, কোন প্রকারের তাড়না পাই নাই।

কেবল একদিনের কথা মনে আছে। তখন আমি পাঁচ ছাড়িয়া ছয়ে পা দিয়াছি। ফাল্গুন মাস, দোল-পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিন। আদালতের ছুটির পরে বাবার পেয়াদারা আসিয়া আমাদের বাহিরের উঠানের নিকট হইতে মাটি কাটিয়া দোলমঞ্চ তৈয়ার করিতেছিল। পরদিনের উৎসবের আনন্দের পূর্ব্ব-আস্বাদনে বাড়ীর সকলেই স্বল্পবিস্তর মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। দোলমঞ্চ প্রস্তুত হইতে অনেক রাত হইয়া গেল। আমার চোখে কিন্তু ঘুম নাই, উৎসবের আয়োজন দেখিতে লাগিলাম। তারপর যখন আর জাগিয়া থাকা সম্ভব হইল না, তখন বাড়ীর ভিতরে যাইবার পথে একটা ঢালু জায়গায় উপরের দিকে মুখ করিয়া মূত্রত্যাগ করিতে বসিলাম। সেই মূত্র আমার পায়ের নীচ দিয়া গড়াইয়া পথে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমার এই মূর্খতা দেখিয়া বাবার ধৈর্য্য নষ্ট হইল। ভদ্রলোকের ছেলের ভদ্রবুদ্ধি হইবে না কেন? শীলতা

এবং আচারের ত্রুটি হইবে কেন? ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না। বাবার হাতে বাল্যকালে যত মার খাইয়াছি তাহা লেখাপড়ায় অমনোযোগের জন্য নহে, কিন্তু এই শীলতা ও সদাচারের ত্রুটীর জন্য। এই দিনও এই কারণেই মার খাইয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে বাবা আমার গায়ে হাত তোলেন নাই বলিয়া এই প্রথম দিনের মারের কথা আজও ভুলিতে পারি নাই। * * *

উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ

(২)

আমি যখন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে যাই তখন ৺চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় জলপাইগুড়িতে মুন্সেফ ছিলেন। সে সময়ে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। * * * চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় জলপাইগুড়িতে ছিলেন। এখান হইতে তিনি আদালতের ছুটী হইলেই উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। চণ্ডীবাবু একদিকে শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি, অন্যদিকে অসাধারণ সত্যানুরাগী ও সরল চরিত্রের লোক ছিলেন। এই দুই কারণে তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই শিক্ষিত সমাজের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইতেন, সকলেই তাঁহার কথা শুনিতে আসিত। এইভাবে সে সময়ে উত্তরবঙ্গে বেশ একটা প্রভাবশালী ব্রাহ্মগোষ্ঠী ক্রমে গড়িয়া উঠে। * * *

শ্রীহট্ট সম্মিলনী

* * * সেকালে কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে এরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এসকলের মধ্যে বোধহয় 'বরিশাল হিতৈষণী' এবং

'ত্রিপুরা-হিতসাধিনী' এই দুইটি সমিতিই সর্ব্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি দুইটির সাহায্যে বরিশাল ও ত্রিপুরা জেলার কলিকাতা প্রবাসী ছাত্রেরা নিজেদের জেলায় অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে বিশেষ সাহায্য করিতেছিলেন। ইঁহারা মেয়েদের পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। মেয়েরা বাড়ীতে থাকিয়া নিজেদের পরিবারের শিক্ষিত লোকদের নিকটে এসকল পাঠ বা অধ্যয়ন করিতেন, বৎসরান্তে সমিতি ইঁহাদের পরীক্ষা লইতেন। যাঁহারা একটু উচ্চ শ্রেণীর পাঠ পড়িতেন, ছাপান প্রশ্নের কাগজ পাঠাইয়া তাঁহাদের লিখিত উত্তর সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিতেন। অন্যেরা মৌখিক পরীক্ষা দিতেন। প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থিনীদের কোনও নিকট আত্মীয় তাঁদের পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করিতেন। মৌখিক পরীক্ষা নিজেরাই করিতেন এবং ফলাফল সমিতির নিকট পাঠাইয়া দিতেন। এইভাবে পরীক্ষা লইয়া সমিতি পরীক্ষার্থিনীদের পারদর্শিতা অনুসারে তাঁহাদের পুস্তকাদি পুরস্কার দিতেন, কখনও বা বৃত্তি পর্য্যন্ত দিতেন। * * *

নব জাতীয়তার উদ্বোধন

আমি জানি না ইহার পূর্ব্বে বাংলা দেশে কোথাও 'জাতীয়' নামে কোন বে-সরকারী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কি না, খুব সম্ভব হয় নাই। অন্যান্য জেলায় এরূপ বে-সরকারী স্কুল খুলিতে আরম্ভ হইয়াছিল বটে। কিন্তু বোধ হয়, অধিকাংশ স্থলেই কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামে এ সকল স্কুলের নামকরণ হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁহার পিতা ৺ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের নামে বরিশালে স্কুল খুলিয়াছিলেন। * * *